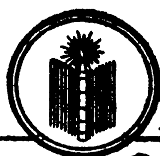
বসন্ত রঙিন

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী



ডি.এম.লাইব্রেরী
৪২, কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট · কলিকাতা — ৬

প্রকাশক : গোপালদাস মজুমদার
ডি. এম. লাইব্রেরী
৪২, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

মূল্য : সাড়ে তিন টাকা

নববর্ষ, ১৩৪৩

শনিরঞ্জন প্রেস, ৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, কলিকাতা-৩৭
হইতে শ্রীপশুপতি দে কর্তৃক মুদ্রিত

বসন্ত রঙিন

শ্রীসুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

প্রীতিভাজনেষু

নতুন জায়গা।

যেদিকে চোখ যায় চোখ যেন আটকে যায়। রেবতী অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। আর রক্তের মধ্যে যেন বাজনা বাজে। তাছাড়া সময়টাও এখন খুব ভাল। মাঘের শেষ। শীত তো বলতে গেলে একরকম নেইই। দুপুরের দিকে রোদটা চড়ে যায়। ঘর দুয়ার উঠোন—যেন গাছপালাও তেতে উঠে বেশ একটু গরম লাগতে আরম্ভ করে। যেন পিঠ গলা ঘামতে আরম্ভ করে। অবশ্য চোখে শরীরের ঘাম দেখা যায় না—একটা ঘাম ঘাম ভাব হয়েছে মনে হয় আর কি। যেন একটু টক খেতে ইচ্ছে করে, একটু ছায়ায় গিয়ে দাঁড়ালে ভাল লাগবে মনে হয়।

হুঁ, আকাশটাও এখন বড় বড় মনে হয়, যেন দিনটা একটু ছড়িয়ে পড়েছে। সেই সকালে চোখ খুলতে না খুলতেই দুপুর, তারপর সূর্য এলিয়ে গেল, আর ঝুপ করে সন্ধ্যা—কার্তিক থেকে সুরু করে অঘ্রাণ পৌষের ক'টা দিন যা কাটে। কান্না আসে।

এখন আকাশের রং বদলে গেছে। সেই সঙ্গে মনেও যেন রং ফোটে। তা তো হবেই। রেবতী কতদিন পর আবার পাড়াগাঁর মুখ দেখল।

মাঘের শেষ। তার মানে বসন্তের সুরু। আমের বোল সরষে ফুল সজনে ফুলের গন্ধে যে বাতাস ভুরভুরে হয়ে আছে এখানে এসেই রেবতী টের পেয়েছে।

আর এসেছে দিন থেকে একটা কোকিল ঘরের পিছনে চালতা গাছের ঝোপের ভিতর থেকে ভীষণ ডাকতে আরম্ভ করেছে। সারাক্ষণ ডাকছে। হুঁ, ডাকছেই তো। কাল বিকালে কথাটা বলছিল মুকুন্দ। ঝাঁকড়া চুল নেড়ে বড় বড় চোখ দুটো ঘুরিয়ে রেবতীর

মুখের কাছে মুখ এনে মিটমিট করে সে হাসছিল তখন। 'কোকিলাও টের পেয়ে গেছে কাকে আমি ঘরে আনলাম।'

মুকুন্দ কোকিল না বলে কোকিলা বলেছিল কেন রেবতী বুঝতে পারেনি। তা নিয়ে মাথাও ঘামায়নি। তবে জোয়ান জবরদস্ত মানুষটা এমন নরম করে মোলায়েম করে কোকিলা শব্দটা উচ্চারণ করেছিল—রেবতী নূতন করে চমকে উঠেছিল। তাই তো, দৈত্যের মতন দেখতে হলে কি হবে, ভিতরটা নরম, মনটা একেবারে ফুলের পাপড়ি। কথাটা চিন্তা করে বেরতী নূতন করে শিউরে উঠেছিল। এই পুরুষ আর এখন রাস্তার অচেনা মানুষ না, ভাড়াটে গাড়ির মতন দু'ঘণ্টা প্রেম করে বিদায় দেবার মন নিয়ে তার হাত ধরে রেবতী এখানে আসেনি।

তাই তো, জায়গাটাও কিছু শেয়ালদা বৌবাজারের রেস্টুরেণ্ট বা হোটেলের পর্দাঘেরা গোপন কামরা নয়, কি সেসব বারোয়ারী অঞ্চলের কোন বাড়ির ভাড়া করা ঘেরা কুঠরী।

মুকুন্দর বাড়ি, তার নিজের জায়গা, টিনের চাল দেওয়া পাকা ভিটের গম-পম করা প্রকাণ্ড ঘর, তকতকে ঝকঝকে এত বড় উঠোন, গরু ছাগল হাঁস মুরগী তাল সুপুরীর গাছ, পুকুর, গোয়াল, ধানক্ষেত পাটক্ষেত।

স্টেশন থেকে আসবার সময় গরুর গাড়ির ছইয়ের বাইরে আঙ্গুল বাড়িয়ে দিয়ে মুকুন্দ বলছিল, হুঁ, এবার রসুলপুর গাঁয়ের সীমানার ভেতর আমরা ঢুকে পড়লাম, ঐ যে দুর্গা মন্দিরের চূড়া, ঐ যে বাড়ুয্যেদের নতুন দীঘি, ঐ তো ঘোড়ামারা মাঠ, মাঠের পাশ দিয়ে গঞ্জে যাবার সড়ক, আর ঐ যে দুটো তাল গাছ পাশাপাশি মাথা উঁচিয়ে আছে—

এই পর্যন্ত বলে রেবতীর দিকে মুখ ঘুরিয়ে মানুষটা হেসেছিল। রেবতীর ঘামে ভেজা হাতটা শক্ত মুঠোর ভিতর টেনে নিয়ে আস্তে চাপ দিয়েছিল। আস্তে চাপ দিলেও কঠিন মুঠোর ভিতর রেবতীর

নরম হাড় কখানা মুড়মুড় করে ভেঙে যেতে চেয়েছিল, কিন্তু তা কি আর ভাঙে, বরং ঐ হাতের চাপে একটা দুর্দান্ত সুখের জ্বালা রেবতীর রক্তের মধ্যে ঝিরঝির করে উঠেছিল।

অর্থাৎ আমাদের যাত্রা শেষ হল, বাড়ি এসে গেছি। মুকুন্দর চোখের ভাষা পড়তে একটুও কষ্ট হয়নি রেবতীর। কোনদিন যে কষ্ট হবে না রেবতী প্রথম দিনই বুঝে গেছে। এই পুরুষের চোখের ভাষা একটি শিশুও পড়তে পারে। শিশুর ভাষা শিশুই তো বুঝবে। এমন মানুষের পাল্লায় পড়ে চল্লিশ বছরের রেবতী ন' বছরের খুকী হয়ে গিয়েছিল। মুকুন্দ তাকে খুকী করে দিয়েছিল।

আমার বাড়ি তার মানে তোমার বাড়ি তোমার ঘর। হুঁ, তোমার উঠোন, তোমার হাঁস মুরগী ছাগল গরু—এখন থেকে এই ঘর দুয়ার তাল সুপুরীর বাগান ধানক্ষেত পাটক্ষেতের ওপর আর আমার একার স্বত্ব রইল না, তোমারও ভোগদখলের অধিকার জন্মাল। আমি তোমাকে অধিকার দিলাম।

গরুর গাড়ি থেকে বাড়ির উঠোনে নেমেই মুকুন্দ প্রথম যে কথাটা বলেছিল—'তোমার ঘর সংসার এবার বুঝে নাও।'

মুকুন্দর মুখের দিকে তখন আর তাকাতে পারেনি রেবতী। শরীরটা কেমন কাঁটা দিয়ে উঠেছিল। তোমার ঘর সংসার। বুকের ভিতর ধাক্কা দিয়েছিল কথাটা। তা তো দেবেই, রোগা লিকলিকে পুরুষ না, দশাসই চেহারা মুকুন্দর, গলার আওয়াজও তেমনি দরাজ। আস্তে কথা বলতে জানে না সে। যেন যখনই যা বলার পাঁচজনকে শুনিয়ে সব বলে। সেদিনও সেই গমগমে গলার স্বর সারা উঠোনে ছড়িয়ে পড়েছিল। আর তাছাড়া এমন একটা কথা। যেন পাঁচ কান শুনিয়ে বলাই নিয়ম।

আমার সব কিছু তোমাকে দিলাম। পাঁচটা কান সাক্ষী রেখে না বললে এই দান অসিদ্ধ থেকে যাবে। মুখের কথা হাওয়ায় মিলিয়ে যেতে কতক্ষণ।

কিন্তু পাঁচজন তো ছিল না সেখানে। থাকার মধ্যে ছিল বলাই আর বাসু। গরুর গাড়ি উঠোনে ঢুকতে দুজন ছুটে এসেছিল। বলাই গোয়াল ঘরের পিছনে কাঁঠাল তলার ছায়ায় বসে ডাব কাটছিল।

আর রাখু ওরফে রাখাল বুঝি বড় সড়কের মোড় ঘুরে গরুর গাড়িটা যখন বাড়ির রাস্তা ধরে তখনই সেটার পিছনে পিছনে চলে এসেছিল দোকানের ঝাঁপ বন্ধ করে। তার তখন বাড়িতে ভাত খেতে যাবার কথা। কিন্তু বাবুর গাড়ি যখন এসে গেছে তখন আর কি। একবারটি তাকে উঠোনে এসে দাঁড়াতেই হবে। তাই তো, বলাই যেমন মুকুন্দর বাড়ির চাকর, তেমনি, ঠিক চাকর না হলেও, মুকুন্দর দোকানেই তো সে কাজ করে। মোড়ের কাছে অশ্বত্থ তলায় মুকুন্দ একটা মুদি দোকান খুলেছে। এখন এই তল্লাটে জনবসতি বেড়েছে, দেখতে দেখতে কত ঘর উদ্বাস্তু এসে গেল, আর ওই সড়ক ধরে পাঁচটা গাঁয়ের মানুষ হাটে গঞ্জে যায়—সব দেখে শুনে মুকুন্দ বুদ্ধি করে এই দোকান বসিয়েছে। রাখু দোকানের কর্মচারী, আঠারো উনিশ বছর বয়স, ছিপছিপে ফরসা চেহারা, মেয়েদের মতন চোখে মুখে সারাক্ষণ একটা লাজুক ভাব লেগে আছে। বলাই এ বাড়ির পুরোন চাকর। মুকুন্দর সেই বাপের আমল থেকে। চুল ভুরু সাদা হয়ে গেছে, চোখ দুটো একটু ঘোলা হয়েছে, কিন্তু তাহলেও কাঠামোটা এখনও বেশ শক্ত মজবুত। এক দমে আট দশ ক্রোশ পথ অনায়াসে হেঁটে চলার ক্ষমতা রাখে চেহারা দেখলে বোঝা যায়। এবং আজও খেতে বসলে ভরাভরতি দু'থালা ভাত না হলে তার মন ওঠে না। উঠোনে দাঁড়িয়ে তারা দুজন কথাটা শুনল। বলাই মুকুন্দর চামড়ার ব্যাগ ও সওদা বোঝাই বড় চটের থলে দুটো গাড়ি থেকে নামাল। রাখালও কিছু হাত গুটিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল না। ছইয়ের ভিতর মাথাটা ঢুকিয়ে দিয়ে রেবতীর ট্রাঙ্ক সুটকেস ও বিছানার বাণ্ডিলটা টেনে বার করল।

রেবতীর তেলতেলে ঘামঘাম সুন্দর মুখখানা দেখে বলাই যে খুবই খুশি হল তার চাহনি দেখে হাসি দেখে বোঝা যাচ্ছিল। দন্তহীন মাড়ি দুটো মেলে ধরে রেবতীকে সে বার বার দেখেছিল। সত্তরের কাছে বয়স, তার চোখে মুকুন্দ যেমন ছেলেমানুষ তেমনি চল্লিশ বছরের রেবতীকেও যে সে একটি কচি খুকীর মতন দেখবে জানা কথা। কাজেই নতুন মানুষটার দিকে তাকাবার সময় বলাইর চোখে লজ্জা সঙ্কোচের ছিঁটেফোঁটা ছিল না, বরং আহ্লাদের সঙ্গে একটা অপত্য স্নেহের ভাব ঘোলাটে চোখ দুটো থেকে ঝরে পড়ছিল।

চোখ তুলে ভাল করে তাকাতে পারছিল না রাখাল। লজ্জায় হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে, কানে মুখে লাল হয়ে উঠছে। তার রকম সকম দেখে মুকুন্দ হেসে ফেলেছিল।

কিরে, তোর হল কি, একবার ছ্যাখ না মুখ তুলে কে তোর সামনে দাঁড়িয়ে আছে। মুকুন্দ এবারও উঠোন ফাটিয়ে কথা বলছিল। তোর পূজনীয় গুরুস্থানীয় ব্যক্তি। কি ডাকবি এঁকে, জেঠিমা না কি খুড়িমা। তোর বাবা আমার ছোট ছিল না বড় ছিল মনে করতে পারছি না এখন। সেটা তুই মনে মনে ঠিক করে ফেলে এঁকে যা ডাকার ডাকবি, আমি আর কি বলব। বলে মুকুন্দ এক নজর রেবতীকে দেখে পরে বলাইর দিকে চোখ ঘুরিয়েছিল। কেমন ঠিক কিনা বলাইদা।

একশ বার। বলাই মাথা নেড়েছিল। হুঁ, আগে পা ছুঁয়ে পেন্নামটা তো সেরে নে। রাখালকে উপদেশ দিতে বলাই ভুল করল না।

রাখাল পাশের গাঁয়ের মানুষ। তার বাবা অনেকদিন আগেই মারা গেছে, সেই যখন সে দুধের বাচ্চা। বাবার কথা তার মনে থাকার কথা নয়, মামা-মামীর কাছে থেকে বড় হয়েছে। এতকাল মামার খেত খামার দেখছিল। কিন্তু দু'বছর ধরে আকাল চলছে, মামার চাষ বাসের অবস্থা খুবই খারাপ তাই সে চলে এসেছে মুকুন্দর

দোকানে চাকরী করতে। এখন মুকুন্দকে সে কাকা জ্যাঠা কিছু ডাকে না, বাবু বলে কাজ চালায়। কাজেই হঠাৎ এই সত্য আগত মানুষটিকে কি ডাকা যেতে পারে চিন্তা করে সে বেশ বিব্রত হয়ে পড়েছিল।

এমন একটা সমস্যা যে তার সামনে উপস্থিত হবে এই ছুদিনের মধ্যে একবারও সে ভেবে দেখেনি। ছুদিন আগেই কথাটা সে বলাইর মুখে শুনেছে। বাবু বিয়ে করছে। কলকাতার মেয়ে। ইদানিং মুকুন্দ একটু ঘন ঘন শহরে যাচ্ছিল, হুঁ, দোকানের মাল কিনতেও বটে, আবার সেই সঙ্গে নিজের জুতোটা জামাটা ছাতাটা কেনার নাম করেও কোন কোনদিন বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেছে। ছু'ঘণ্টা পর পর কলকাতার ট্রেন। তাও সওয়া ঘণ্টার রাস্তা। বাড়ী থেকে বেরিয়ে বড় সড়কের মোড়ে গিয়ে দাঁড়ালে এক আধটা সাইকেল রিক্সা যে কখন সখন চোখে পড়ে না এমন না। রিক্সা না জুটলেও অসুবিধা কিছু নেই। মাইল তিনেকের তো মামলা। একটু জোরে পা চালিয়ে গেলে আধঘণ্টা বিশ মিনিটের মধ্যে দিব্যি তুমি মেহেদীর বেড়া ঘেরা সোহাগপুর রেলস্টেশনের লাল টুকটুকে বাড়িটার সামনে পৌঁছে যেতে পার। তারপর আর কি, টিকিট কেটে ট্রেনে চাপলেই হল। ভাল করে হাতের খবর কাগজখানা পড়ে শেষ করার আগেই শেয়ালদা স্টেশন।

ইলেকট্রিক ট্রেন হয়ে এই সুবিধাটা হয়েছে। তাহলেও সকালের গাড়িতে কলকাতা গেলে মুকুন্দ যে ছুপুরের গাড়িতে ফিরে এসেছে তা নয়, কোনদিন বিকেলের ট্রেনে ফেরে, কোনদিন রাত হয়, আবার শহরে রাত কাটিয়ে পরদিন সকালের গাড়িতেও বাড়ি ফিরেছে। কিছু ঠিক থাকে না। এদিকে যেন আরো ঠিক থাকত না।

কথাটা বলাই বুঝত।

কেবল যে হাতে কাজ নিয়েই মুকুন্দ কলকাতা ছুটে যাবে এমন কি কথা আছে। অবশ্য কাজ লেগেই থাকে। দোকান আছে, দোকানের মালপত্তর কিনতে হপ্তায় একবার শহরে না গেলে চলে না।

এদিকে বাগান আছে পুকুর আছে। ফুল ফলের বীজটা কলমটা, মাছের ডিম, চারামাছ—যা হোক কিছু একটা কিনতে হলে মুকুন্দর কলকাতা যাওয়া চাই। তেমনি নিজের জামাটা জুতোটা। উঁহু, এসব তল্লাটের হাটগঞ্জের জিনিস মুকুন্দর কোন দিনই পছন্দ হয়নি। সেই ছোট বেলা থেকে তো বলাই তাকে দেখছে। যতদিন বাবা ছিল মুকুন্দ গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়িয়েছে। যেমন মেজাজ তেমনি শখ। না হবার কথা কি, পয়সার তো অভাব ছিল না তার বাবার। এ তল্লাটের সবচেয়ে বড় চাষী। তায় কিনা এক ছেলে। একটা বোন না পর্যন্ত। কাজেই যতটা আদর পাবার আদর লুটবার মুকুন্দ পেয়েছে, লুটেছে। বায়স্কোপ দেখতে থিয়েটার দেখতে ময়দানের খেলা দেখতে মুকুন্দর উৎসাহের শেষ ছিল না। আবার এমনিও বন্ধুবান্ধব নিয়ে কলকাতা বেড়াতে গেছে। ঘুরে ঘুরে চিড়িয়াখানা দেখেছে, যাদুঘর দেখেছে, হাওড়ার পুল টাকশাল দমদম উড়ো জাহাজের ডিপো সব দেখা শেষ করে হোটেল রেস্টুরেণ্টে খেয়ে তারপর বাড়ি ফিরেছে।

তা সেসব দিন একভাবে গেছে।

এক ভাবে মানুষের কিছু চিরকাল যায় না। বাবা মরল, বছর না ঘুরতে মা-ও স্বর্গে গেল। চাষ বাস নিয়ে গোটা সংসারটা দেখাশোনার ভার মকুন্দর ঘাড়ে চাপল।

কিন্তু দেখা গেল মুকুন্দ বেশ হুঁসিয়ার মানুষ।

বলাইর আশঙ্কা ছিল, বাবার আদুরে ছেলে, কাঁচা বয়েসের লাগামছাড়া স্বভাবটা না রয়ে গেছে, দু হাতে টাকা ওড়ান আর বন্ধুবান্ধব নিয়ে কেবল ফুর্তি করে বেড়ান। কিন্তু না, মুকুন্দ শক্ত হাতেই লাগাম টেনে ধরল। ঘর গৃহস্থালী বা ক্ষেত খামারের কাজ সব কিছুর ওপর কড়া নজর। অবশ্য বাপের মতন বাড়াতে কিছুই পারল না, কিন্তু তখন যে দিনকাল ভাল ছিল। বিষয় সম্পত্তি বাড়াতে না পারুক, হাতের মুঠোয় যতটা ছিল শক্ত করে সবটা ধরে রাখল, মুকুন্দ ক্ষয়ে যেতে দিল না কিছু। সেটা কম কথা কি। মোটের ওপর দিন

একরকম ভালই কাটছিল, বাকি জীবন সে এ ভাবেই কাটিয়ে দিত। কুলীনের ঘরের সুন্দরী মেয়ে বিয়ে করেছিল। ছেলেপুলে অবশ্য হল না। তার জন্য মুকুন্দর খুব একটা দুঃখ ছিল না। ভগবান যখন দিল না, এ নিয়ে আপসোস করে লাভ নেই—কথাটা প্রায়ই তাকে বলতে শোনা গেছে। গায়ে শক্তি যেমন রাখে তেমনি তার মনের জোর। এই মনের জোর নিয়ে সে চলছিল।

কিন্তু হঠাৎ কোন দিক দিয়ে কী হয়ে গেল!

চলতে চলতে মানুষটা থেমে গেল।

তার হাত পায়ের আর জোর ছিল না। সেদিন থেকে যেন সে ভেঙে পড়ল। সে জানত না মাঝ বয়সে এমন একটা দুর্দৈব তার জন্য অপেক্ষা করছিল।

তা না হলে যেমন মন ছিল মেজাজ ছিল, তেমনি সংসারের সব কাজে তার প্রচুর উৎসাহ উদ্যম, কেবল রসুলপুর কেন, পাঁচটা গাঁয়ের মানুষ দেখেছে।

দেখতে যেমন দৈত্যের মতন, তেমনি দৈত্যের মতন খাটতেও পেরেছে মুকুন্দ। সারাদিন লোকজনের সঙ্গে থেকে মাঠে ঘুরে ঘুরে তাদের কাজ দেখেছে, পুকুরের তদারকী করেছে, নিজের হাতে বাগানের যত্ন করেছে। এত বড় একটা গোলাপ ফুটেছে মুকুন্দর বাগানে। এত বড় একটা পেয়ারা হয়েছে তার গাছে। তার পুকুরের জাঁদরেল সব রুই কাতলা দেখে লোকের চোখ জুড়িয়েছে, আবার কারো কারো চোখ টাটিয়েছে। হুঁ, তাদের হয়তো পুকুর আছে, কিন্তু মুকুন্দর মতন মাছের চাষ তারা করতে জানে না, মুকুন্দর মাছের মতন তাদের মাছ বড় হয় না ওজনেও বাড়ে না। কিন্তু তা বলে মুকুন্দকে কি তারা হিংসা করত? তা নয়। গাঁয়ের ছোট বড় সবাইকে মুকুন্দ ভালবেসেছে, সকলের সঙ্গে তার সদ্ভাব। তেমনি সেও সকলের ভালবাসা পেয়েছে। তা ছাড়া কতভাবে কতজনকে সে সাহায্য করেছে এই জীবনে। সেই ছোটবেলা থেকে তার

এই স্বভাব। মানুষের উপকার করতে পারলে সে আর কিছু চাইত না।

মানুষটা দেখতে যেমন বড়, মনটাও বড়। কথাটা সকলেই এক বাক্যে স্বীকার করত। আজও করে। আজও মানুষের উপকার ছাড়া অপকারের কথা সে চিন্তা করতে পারে না।

তাই না অনেকেই বলাবলি করছিল, এত ভাল মানুষ, এমন সুন্দর নিখুঁত একটা চরিত্র, ঈশ্বর তাকে সুখী হতে দিল না।

এক এক সময় মুকুন্দর মনে হয়েছে, জোর করে সে সুখী হতে চেয়েছিল, সন্তুষ্ট থাকতে চেয়েছিল, জীবনটাকে সুন্দর করতে চেয়েছিল। সময় হবার আগেই বাবা স্বর্গে গেছে তো গেছে, নিজের কোন সন্তান হল না তো হল না, গেলবার মন্দার বাজার গেছে তো এ বছর খরা চলেছে, চাষ বাসের অবস্থা খারাপ। হোক খারাপ, আবার ভালো হবে; আবার সুদিন আসবে—অর্থাৎ কোন ব্যাপারে ভেঙে পড়েনি, মন খারাপ করেনি, মুখ কালো করেনি মুকুন্দ। মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ে হা হুতাশ করতে বলাই তাকে কোনদিন দেখেনি। বলাই তার সবচেয়ে কাছের মানুষ। বলতে গেলে এ বাড়ির একজন সে। চব্বিশ ঘণ্টা কর্তাবাবুর ছেলেকে দেখছে।

যেন একটা অন্যরকম শক্তি মুকুন্দর মধ্যে ছিল। এই শক্তি তাকে চালাচ্ছিল। সব সময় সে সজীব। সব সময় তার মুখে হাসি। সর্বদাই স্ফূর্তিবাজ।

এদিকে নতুন ছু নল। বন্দুক কিনে ফেলল মুকুন্দ। হাতে কাজ কর্ম কম থাকলে বন্দুক নিয়ে হুটহাট শিকার করতে চলে গেছে হাঁসখালির বিলে কি রুদ্রপুরের জঙ্গলে। হয়তো আরো দূরে—সেই কোথায় বিশালাক্ষীর বনে। বলাই কোনদিন সে সব জায়গায় যায়নি। শুনেছে বাঘ আছে। সুন্দরবনের কাছাকাছি বন।

বলাই যদি কখনও নিষেধ করেছে মুকুন্দ হেসে বলেছে, অত ভয় করলে হয় বলাইদা? আমার প্রাণের ভয় করছ তো? কথায় বলে

রাখে হরি তো মারে কে, মারে হরি রাখে কে। বিশালাক্ষীর বনে বাঘের হাতে মরণ যদি আমার কপালে লেখা থাকে তো, কেউ তা আটকাতে পারবে না।

যেন কপালের লেখন মুকুন্দ পুরোপুরি বিশ্বাস করত। শেষ পর্যন্ত করতে পেরেছিল কিনা বলাই কিন্তু আর জিজ্ঞাসা করেনি। জিজ্ঞাসা করার মতন মনের অবস্থা তারও ছিল না। সেও খুব দুঃখ পেয়েছিল, মুষড়ে পড়েছিল। এমন একটা ঘটনা। যেন কিছুতেই বিশ্বাস করা যায় না।

অথচ ঠিক ঘটল। এতকাল যদি মুকুন্দর নিয়তির আকাশে ছেঁড়াখোড়া দু একটা মেঘ আনাগোনা করে আবার এক সময় কেটে গেছে, এই মেঘ কিন্তু আর কাটল না। ঝড় নিয়ে এল, অমাবস্যার অন্ধকার নিয়ে এল। মুকুন্দকে একেবারে তছনছ করে দিল।

হ্যাঁ, শখ। শিকারের শখটা নতুন। কিন্তু পুরোনো শখগুলিও মুকুন্দ যত্ন করে বাঁচিয়ে রেখেছিল। মরতে দেয়নি। ফুলের শখ, গাছের শখ। তেমনি কদিন পর পর কলকাতা গিয়ে থিয়েটার বায়স্কোপ দেখে আসা অথবা ময়দানের খেলা। শীতকালে সার্কাস। বা এমনিও শুধু বেড়াতে যাওয়া, হোটেল রেস্টুরেন্টে খাওয়া, ঘুরে ফিরে এটা ওটা দেখা। আগে বন্ধুরা সঙ্গে থাকত, কিন্তু তারপর সঙ্গে থাকত বৌ।

বলাই বলত, বৌমা।

ফর্সা টুকটুকে গায়ের রং, আঁটসাঁট গড়ন, ছেলেপুলে হয়নি তাই শরীরের বাঁধুনিটা বরাবর সুন্দর ছিল।

এ তো খুবই জানা কথা, সন্তান না থাকলে মেয়েদের বুক খালি খালি ঠেকে, মন ফাঁকা লাগে। তাই যেন বৌয়ের মন অন্যভাবে ভরিয়ে দিতে মুকুন্দ রাত দিন চেষ্টা করত। আদর যত্ন একটু বেশিই পেয়েছিল ওই মেয়ে। মুকুন্দ যখনই কোলকাতা কি অন্য কোথাও বেড়াতে গেছে বৌ সঙ্গে গেছে। বাড়িতে একা একা সে কার কাছে থাকবে, কী নিয়ে থাকবে। স্ত্রীকে সঙ্গে না নিয়ে মুকুন্দ কোথাও যেত

না। যেন এদিকে জিনিসটা আরো বেড়ে গিয়েছিল। শিকার করতে যাবার সময়ও বৌকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া চাই। পাড়াগাঁর মানুষ আড়ালে আড়ালে ফিসফিস গুজগুজ করত। বলাই টের পেত। যত বয়স বাড়ছে মুকুন্দ তত বৌ-নেওটা হয়ে পড়ছে। নিন্দার কিছু না, তবু যেন লোকের চোখে এটা কেমন ঠেকত। আর বলাই তো সবই চোখের ওপর দেখেছে। আগে মুকুন্দ বন্ধুদের সঙ্গে নিয়ে যখন কলকাতা গেছে দুহাতে টাকা খরচ করেছে। হুঁ, তখন দশজনের জন্য খরচ করত, তারপর করত একজনের জন্য এবং তখন আর দুহাতে নয়, যেন পাঁচ হাতে খরচ করতে পারলে মুকুন্দ খুশি হয়েছে—এবং করেছেও খরচ।

বৌকে নিয়ে কাপড়ের দোকানে ঢুকেছে তো একটার জায়গায় পাঁচটা শাড়ি কেনা হয়েছে—বৌ আঙুল দিয়ে দেখিয়েছে, এটা দাও, ওটা দাও, মুকুন্দ কথাটি না বলে মাণিব্যাগ খুলে টাকা বার করে দিয়েছে। তেমনি গয়নার দোকানে ঢুকলে পাঁচ রকম গয়না কিনে দোকান থেকে বেরিয়েছে। গায়ে আর সোনাদানা ধরছিল না। তাতে কি, পুরোন জিনিস বাক্সে তুলে রেখে বৌ নতুন গয়না পরেছে। তাই নিত্য নতুন অলঙ্কার কেনার ধুম। বাপের আমলের মানুষ বলাই, বয়েসও অনেক হয়েছে, খরচপত্রটা বেশি করে ফেলেছে দেখলে সময় সময় একটু বিরক্ত হয়ে মুকুন্দকে যে দু একটা কথা সে না বলেছে এমন নয়, কিন্তু মুকুন্দ তৎক্ষণাৎ হেসে জবাব দেয়, আমার আর আছে কে বলাইদা, কার জন্য রেখে যাব—কাজেই—বাকিটা আর বলতে হত না, বলাই বুঝে নিত। অর্থাৎ এই সংসারে যখন আর কেউ আসবে না, আসবে সেই সম্ভাবনাও শেষ হতে চলেছে, তখন যে-মানুষ আছে তার জন্যই উজাড় করে সব ঢেলে দেব, তার সুখের জন্যই এই ঘর দুয়ার বাগান পুকুর ক্ষেতখামার।

বৌকে সুখ দিয়েছিল মুকুন্দ, অন্তত যতটা পেরেছিল দিতে চেষ্টা করেছিল।

কিন্তু কার মনে কি আছে কে জানে।

কেমন যেন একটা ঝাপটা দিয়ে মুকুন্দর চোখের সামনের বাতিটা নিবিয়ে দিয়ে গেল সেই মানুষ।

নিয়তি একসঙ্গে এমন নিষ্ঠুর হতে পারে রসিক হতে পারে মুকুন্দকে দেখার আগে বুঝি কারো জানা ছিল না। কথাটা তেমন করে হয়তো কেউ বিশ্বাস করত না। মুকুন্দকে দেখে বিশ্বাস করেছিল।

সেদিন এক হাতে বলাইকে সব দিক সামলাতে হয়েছে। ঘর দুয়ার ক্ষেতখামার দেখাশোনা করা। পাগলের মতন হয়ে গিয়েছিল মুকুন্দ। ঘরে ফেরার সময়ের ঠিক নেই, স্নান খাওয়ার ঠিক নেই, কেমন যেন একটা ঘোরের মধ্যে তার দিনগুলি কাটছিল। নিজের মনে মাঠে ঘাটে ঘুরছে তো ঘুরছে। রোদে যেন মাথা পুড়ছে, বৃষ্টিতে ভিজে জামাকাপড় চোবাচোবা হয়ে গেছে খেয়াল নেই, দিশা নেই। আবার তিনদিন হয়তো ঘর থেকে বেরোলোই না। দোরে খিল এঁটে পড়ে রইল। বলাই হাজার বার ডাকল, দরজায় ঘা দিল—কোন সাড়া শব্দ পেল না। তারপর হঠাৎ ঝোঁক চাপল কলকাতা যাবে, এককাঁড়ি টাকা নিয়ে গেল কলকাতা, সাতদিনের আগে হয়তো ফিরলই না।

একটা বছর এভাবে কাটল। তারপর যেন ঘা-টা আস্তে আস্তে শুকোতে আরম্ভ করল। একটু সুস্থ হল মুকুন্দ। আবার চাষবাস দেখা শোনায় মন দিল। বাগানে ঘুরে ফুল ফলের গাছগুলি দেখল, জেলেদের ডেকে পুকুরে জাল ফেলে মাছের অবস্থা পরীক্ষা করল। কিন্তু কেমন চুপচাপ—সেই জোর গলায় হাসি নেই কথা নেই। বোঝা যাচ্ছিল বাইরের ঘা শুকোলেও ভিতরের ঘা শুকোতে দেরি হচ্ছিল। বলাইর সঙ্গে ভাল করে কথা বলত না। ঠিক তার ক'দিন আগে দোকানের ক্যাশ ও বেশ কিছু মালপত্র নিয়ে আগের কর্মচারীটা পালিয়ে যায়। নিদান। পাশের গাঁয়ের ছেলে। আগে বোঝা যায়নি

পরে জানা গেছে ছোঁড়া লুকিয়ে মদ গাঁজা খেত। বলাই তাকে ধরে আনতে চেষ্টা করেছিল কিন্তু মুকুন্দ বাধা দেয়—তার টাকাকড়ির দরকার ছিল তাই চুরি করে পালিয়েছে। এই নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই। অর্থাৎ অন্য আর পাঁচটা ব্যাপারের মতন এ ব্যাপারেও মুকুন্দ কেমন উদাসীন নীরব হয়ে রইল। অবশ্য এই স্বভাব তার আগেও কিছুটা ছিল, যেন মানুষকে ক্ষমা করতে পারলে সে খুশি হত। অন্যায়ের বিরুদ্ধে শক্ত হয়ে দাঁড়াতে কোনদিনই তেমন একটা গ্রাহ্য করত না। এইজন্য বলাই তার ওপর সময় সময় অসন্তুষ্ট হয়েছে। আমার ক্ষতি হয়ে গেল, ক্ষতি হচ্ছে, অথচ চুপ করে থাকব, এ কেমন কথা এই উদারতার অর্থ কি। মুকুন্দ তখন হেসে বলত, দুনিয়ায় বেঁচে থাকতে হলে কিছু কিছু ক্ষয় ক্ষতি স্বীকার করে নিতেই হয় বলাইদা, উপায় নেই।

হয়তো তার কথা শুনে নিয়তি সেদিন দাঁত বার করে হেসেছিল। ক্ষেতের ধান চুরি পুকুরের মাছ চুরি কি দোকানে চুরি হওয়া তেমন কিছু না, আরও বড় ক্ষতি বড়রকমের অন্যায় মুকুন্দর জন্য অপেক্ষা করছিল—সেদিন সে কতটা উদাসীন থাকে নীরব থাকে দেখতে জানতে তার ভাগ্যদেবতা নিশ্চয় উসখুস করছিল।

কিন্তু মুকুন্দ সত্যি নীরব থাকল। যেন মুখ বুঁজে এতবড় অন্যায়টা হজম করা ছাড়া তার আর কিছু করার ছিল না। সেদিনও সে শক্ত হতে জানল না কঠিন হতে পারল না। এবং আশ্চর্য, বলাই সেদিন মুকুন্দর ওপর আর অসন্তুষ্ট হতে পারল না। যেন বলাইও বোবা হয়ে গিয়েছিল হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছিল। যে অন্যায় করল তাকে মনে মনে ক্ষমা করে উদ্‌ভ্রান্ত অস্থির মুকুন্দ মাঠেঘাটে ঘুরে বেড়াল, ঘরের দরজায় খিল এঁটে কেঁদে বুক ভাসাল। বুঝি বলাইও হতভাগ্য মানুষটার কথা চিন্তা করে লুকিয়ে দু ফোঁটা চোখের জল ফেলল।

নিদান পালিয়ে যাবার পর দোকানে নূতন কর্মচারী রাখা হল।

রাখাল। বিধবা মায়ের একমাত্র ছেলে। বলাই খুঁজেপেতে তাকে আনে। মুখচোরা লাজুক ছেলেটি। বয়সটাও নিদানের চেয়ে অনেক কম। এখনও কুসংসর্গে মেশেনি নেশাভাং করতে শেখেনি। দোকানে যখন খদ্দের থাকে না, কেনাবেচা বন্ধ থাকে, রাখাল তখন মাথার ওপর থেকে খাঁচাটা পেড়ে নিয়ে তার পোষা শালিখটাকে আদর করতে আরম্ভ করে। পাখিটার নাম রেখেছে 'শম্ভু'—রাখালের ট্রেনিং পেয়ে শম্ভু চমৎকার কথা বলতে পারে, শিস দেয়। উঠতি বয়সের বখাটে ইঁচড়ে পাকা ছেলেছোকরার অভাব নেই। গাঁয়ের দোকানের আশেপাশে ঘুরঘুর করে কদিনই তারা রাখালের সঙ্গে ভাব জমাতে চেষ্টা করেছিল। দোকানে বসে আড্ডা দেবে বিড়ি সিগারেট খাবে এই মতলব। নিদানের আমলে তাই হয়েছিল। কিন্তু বলাই গোড়া থেকে রাখালকে সাবধান করে দিয়েছিল, এদের কাউকে যেন দোকানে না ঢোকায়। রাখাল বলাইর কথা রেখেছে। কোনো বাজে ছেলে দোকানে ঢুকতে পারে না। রাখাল একা একা তার শম্ভুকে নিয়ে খেলা করে, তার সঙ্গে কথা বলে, আর যখন খদ্দের আসে তখন দাঁড়িপাল্লা তুলে ডালটা নুনটা ওজন করতে বসে। এই জন্য বলাই রাখালের ওপর সন্তুষ্ট। মুকুন্দও রাখালকে স্নেহ করে।

হুঁ, যে কথা বলা হচ্ছিল। একটু সুস্থ হয়ে উঠে মুকুন্দ দোকানের দিকেও নজর দিল। মালপত্র প্রায় কিছুই ছিল না। আবার হপ্তায় হপ্তায় কলকাতা গিয়ে পাইকারদের কাছ থেকে মাল আনতে লাগল। দোকানটাকে বড় করল, নতুন করল সাজাল, ডাল তেল নুন লংকা ছাড়াও গায়ে মাথার সাবান মাথার সুগন্ধি তেল চুলের ফিতে কাঁটা স্নো ক্রিম আলতা পাউডার ইত্যাদি পাঁচরকম মনোহারী জিনিস এনে দোকান ভরিয়ে তুলল।

যেন দোকানের ব্যাপারেই মুকুন্দ এদিকে ঘনঘন কলকাতা যাচ্ছিল। একদিন কলকাতা থেকে ফিরে এসে বলাইকে এমন আভাস দিল,

যেন আবার সে একটা বিয়ে করছে, একটি ভাল মেয়ে পাওয়া গেছে, খুব শীগগীরই কাজটা সেরে ফেলবে মনে মনে সে ঠিক করেছে। বলাই ভয়ানক খুশি হল। সে আশা করতে পারেনি আবার নূতন করে সংসার পাততে মুকুন্দর মন বসবে। তা না বসাবার আছে কি, বলাই সঙ্গে সঙ্গে চিন্তা করল, এখনও যার চল্লিশের ঘরে বয়েস, এমন চমৎকার স্বাস্থ্য শরীরের এমন মজবুত বাঁধুনি, এই পুরুষ আর কতদিন মেয়েমানুষ ছাড়া থাকতে পারে। তাই তো, আবার একটি বৌ ঘরে না আনলে যে মুকুন্দর ভিতরের ঘা কিছুতেই শুকোবে না, এই জন্যই তার বিয়ে করা দরকার। খুব ভাল, চমৎকার হবে মুকুন্দ। তোর বিয়ে করা দরকার। পাকা ভুরু কপালে তুলে দাঁতপড়া মাড়ি দুটো বার করে বলাই অনেকদিন পর হাসতে পারল।

কার মেয়ে কোথাকার মেয়ে, কত বয়স সে সব কিছুই সে জিজ্ঞাসা করল না।

মুকুন্দর মনে ধরেছে, এটাই মেয়ের আসল পরিচয়। আর কিছু জানার দরকার পড়ে না। বলাই শুধু অপেক্ষা করতে লাগল সেই শুভ দিনটির। বিয়ে করে মুকুন্দ রাঙ্গা টুকটুকে বৌটিকে কবে ঘরে আনবে।

অবশ্য এই জন্য বলাইকে বেশি দিন অপেক্ষা করতে হল না। দিন তিনেক পর মুকুন্দ আবার কলকাতা গেল। ফিরে এসে বলল, বিয়ে হয়ে গেছে, আগের বারের মতন ঢাকঢোল সানাই বাজিয়ে এই বিয়ে হয়নি, বিয়ের অফিসে গিয়ে লেখাপড়া করে কাজটা সে সেরে এসেছে। শুনে বলাই একটু থতমত খেল। এমন বিয়ের কথা অবশ্য দু একজনের মুখে যে সে এর আগে না শুনেছে এমন নয়, আজকাল শহরে নাকি এ ধরনের বিয়ে হয়। কিন্তু রসুলপুর বা আশেপাশের আর পাঁচটা গাঁয়ের কোনো মানুষ চুপিচুপি এতবড় একটা কাজ কোনাদিন করেছে বলে সে জানত না। কোনোদিন

শুনেওনি। সে আশা করেছিল, আবার এবাড়িতে আলোটালো জ্বলবে বাদ্যভাণ্ড বাজবে মেলা বাজী পুড়বে এবং পাঁচটা গাঁয়ের মানুষ এসে পাতা বিছিয়ে নেমন্তন্ন খেয়ে যাবে। মুকুন্দর আগের বিয়ের স্মৃতি বলাইর চোখের সামনে জ্বলজ্বল করছিল। সেদিন গিন্নীমা বেঁচে ছিলেন, বলাইরও বয়স কম ছিল। কদিন ধরে কত খাটতে হয়েছিল তাকে।

বলাই মুখ কালো করে আছে দেখে মুকুন্দ হেসে তাকে বুঝিয়েছে, এই বয়সে আর এত খরচপত্র করে জাঁকজমক করে—বুঝলে না বলাইদা? কেমন যেন ইচ্ছা হল না। একদিন তো খুব ঘটা করেই কুলীনের ঘরের মেয়েকে ঘরে এনেছিলাম—শেষ পর্যন্ত তার ফলটা কী দাঁড়াল, তুমিও দেখেছ, আমিও দেখলাম—কাজেই।

মুকুন্দর মুখে হাসি ছিল, কিন্তু গলার স্বরটা যে থমথম করছিল, চোখ দুটো হঠাৎ চিকিয়ে উঠল, বলাই পরিষ্কার দেখতে পেল।

কাজেই চুপ করে রইল। চুপ থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। অর্থাৎ তেমন আর একটা বিয়ের ওপর মুকুন্দর ঘেন্না ধরে গেছে। আর বিয়েই করতে চাইছিল না সে। কিন্তু ঘরে একটি মানুষ না আনলেই না হয়, তাই কোনো রকমে, যাকে বলে নিয়মরক্ষা। সেভাবেই কাজটা সেরে এসেছে সে।

ভালই হয়েছে, ভাল করেছে।—বলাই এবার অনেকটা হাল্কা হতে পারল। মনের সঙ্গে মনের মিল হলে অত বাদ্যভাণ্ড মন্ত্রপাঠের দরকার পড়ে না! তা হলে কবেতক বৌমা বাড়ি আসবে? এখন বুঝি বাপের কাছে আছে?

আবার সেই বৌমা! মুকুন্দ একটু চমকে উঠল। তারপর সামলে নিয়ে অল্প হেসে ঘাড়টা কাত করল। হুঁ, বাপের কাছেই আছে বটে। এই শনি রোববার সকালে গিয়ে নিয়ে আসব।

শনিবার বাবু কলকাতা থেকে ফিরল না। রবিবার সকাল থেকেই বলাই বার বার রাস্তার দিকে তাকাচ্ছিল। সঙ্গে মালপত্র থাকবে। তা ছাড়া ছু ছুটো মানুষ। স্টেশন থেকে রিক্সা নিলে সুবিধা হবে না। গরুর গাড়ি করে মুকুন্দ বৌকে নিয়ে বাড়ি আসবে বলাই জানত। তাই ছুপুরের দিকে ছুবার বড় রাস্তার মোড় পর্যন্ত এগিয়ে গিয়ে সে দেখে এসেছিল দূরে গরু বা মোষের গাড়ির মতন কিছু দেখা যায় কিনা। কিন্তু সেরকম কিছু দেখতে না পেয়ে ফিরে এসে সে হাতের কাজটা সেরে ফেলছিল। গোয়ালঘরের পিছনে কাঁঠালতলায় বসে জাব কাটছিল। কখনও ছুবার তিনবার দরজায় উঁকি দিয়ে দেখেছে গরুর গাড়ি মোষের গাড়ি কিছু দেখা যায় কিনা। বাবু আজ বৌ নিয়ে আসবে শুনে তারও কম আনন্দ হচ্ছিল না।

না, এ বাড়ির সব ঘটনা রাখাল জানত না। বাবু আগে একবার বিয়ে করেছিল, সেই বৌ এখন কোথায় আছে, বেঁচে আছে কি মরে গেছে সেসব কিছুই বলাই তাকে বলে নি। ছেলেমানুষ, আর একটা সংসার সম্পর্কে সব কিছু জানতে শুনতে রাখালের তেমন আগ্রহও ছিল না, কৌতূহলও ছিল না। সে শুধু ধরে নিয়েছে বাবু এতকাল বিয়ে করেনি, ভারি বয়সে এবার একটা বিয়ে করল।

বেলা চড়ে গিয়েছিল। ছু তিনবার রাস্তায় উঁকি মেরে কোনো গাড়িটাড়ি দেখতে না পেয়ে সে শেষটায় ভাবল, বাবু এবেলা না এসে ওবেলা আসবে, বিকেলের ট্রেনে আসবে। তার ক্ষুধা পেয়েছিল। দোকানে ঝাঁপ বন্ধ করে ভাত খেতে সে বাড়ির দিকে রওনা হবে এমন সময় দূরে একটা গরুর গাড়ি দেখতে পেয়ে তৎক্ষণাৎ ছুটে গিয়েছিল। তারপর গাড়ির সঙ্গে সঙ্গে হেঁটে বাড়ি এসেছে।

যাই হোক, সেদিন নতুন মানুষটির সামনে তাকে খুব বেকায়দায়

পড়তে হয়েছিল। বলাইর কথা মতন রেবতীকে ঢিপ করে প্রণাম করে সে যখন সোজা হয়ে দাঁড়াল রেবতী তখন মুখে আঁচল চাপা দিয়ে হাসছিল। মুকুন্দও হাসছিল। রেবতীর চোখে চোখ রেখে বলল, 'আমার দোকানের ম্যানেজার ইনি।'

শুনে রেবতীর আরও হাসি পেল।

'আর এই বুড়ো হল গিয়ে'—মুকুন্দ আঙুল দিয়ে বলাইকে দেখিয়ে বলল, 'আমার ঘরবাড়ি ক্ষেত খামার বাগান পুকুর—এক কথায় গোটা এস্টেটের ম্যানেজার—হুঁ আমার বলাইদা, এই মানুষটি না থাকলে —আমার বিষয় আসয় তো বটেই, আমিও যে কবে রসাতলে তলিয়ে যেতাম তার কিছু ঠিক ছিল না।'

ম্যানেজার এস্টেট কথাগুলি হয়তো বলাই বুঝল না। তবে মুকুন্দ যে বৌমার কাছে তার প্রশংসা করছে—সে না থাকলে এই সংসারটা একেবারে নষ্ট হয়ে যেত, বৌমা বাড়িতে পা দিতে না দিতে মুকুন্দ হড়বড় করে সব বলে দিচ্ছে, তাতে বলাই একটু লজ্জিত হল, আবার খুশিও হল, খুশিই বেশি হল। চোখ দুটো বড় হয়ে উঠল তার এবং দেখতে দেখতে ঘোলা চোখে জল এসে গেল। কথা বলতে গিয়ে তার ঠোঁট কেঁপে উঠল।

'বুঝলে বৌমা'—রেবতীর দিকে গলাটা বাড়িয়ে দিয়ে বলাই হঠাৎ হাসছিল কি কাঁদছিল বোঝা গেল না, 'কর্তাবাবুর আমল থেকে আমি এ-বাড়ির চাকর, খোকাবাবুকে কোলে পিঠে করে মানুষ করেছি, কত মারধরও করেছি।'

'আমি শুনেছি।' মুখ থেকে আঁচল নামিয়ে রেবতী সুন্দর করে হাসল। 'বাপ মা মরে গেল অল্প বয়সে, তুমিই তো বাবুর অভিভাবক ছিলে।'

'হুঁ, কত বড় একটা সংসার, একটা রাজ্য খোকাবাবুর কাঁধে চাপল। এই বুড়োটা সঙ্গে সঙ্গে থেকে যতটা পারল দেখল, সাহায্য করল। তা আমার খোকাবাবুর মত করিৎকর্মা চৌকস ব্যক্তি কটা আছে এ তল্লাটে।'

'থাক আর আমার প্রশংসা করতে হবে না বলাইদা, এবার বাক্স বিছানাটা ঘরে নিয়ে যাও।' মুকুন্দ পরে রাখালের দিকে তাকাল।

'রাখাল, এই তোর দোকানের মালপত্র, ব্যাগ তুটো যত্ন করে ঘরে তুলে রাখ—হুঁ, খাওয়া দাওয়া সেরে ওবেলা ফর্দ মিলিয়ে সব দোকানে তুলবি।'

রেবতী অবাক হয়ে পাড়াগাঁর তুটি নিরীহ সরল মানুষকে দেখছিল। একজনের মাথার চুল শনের মতন সাদা হয়ে গেছে। আর একজনের মাথায় বর্ষার জলে পুষ্ট নধর কচি ঘাসের মতন থোকা থোকা চুল। একজনের গায়ের চামড়া শুকনো খেজুরের মত কুঁচকে গেছে, আর একটি চামড়া আশ্বিনের আতার মত ঝকঝকে মসৃণ। তুইটি মানুষকে ভাল লাগছিল রেবতীর। যেমন এখানকার আকাশ রোদ গাছগাছালি পাখি দেখে ভাল লাগছিল।

ভাল লাগবে রেবতী সেদিনই বুঝতে পেরেছিল। বৌবাজারের সেই পুরোনো চারতলা বাড়িটা হঠাৎ তার চোখের সামনে ভেসে উঠল। নিচে কাঠের দোকান। রং বার্নিশের ওষুধ ওষুধ গন্ধটা মনে হলে এখনও যেন গা গুলায়। মাথা ঝিমঝিম করে। সেই গন্ধ ভরা কাঠের দোকান পার হয়ে রেবতীকে ওপরে উঠে যেতে হয়েছে। প্রকাণ্ড সিঁড়ি। অন্ধকার। ছুঁচোর গায়ের গন্ধ, আরসোলার গন্ধ নাকে আসত। কেমন যেন গা ছম্‌ছম্‌ করত। যদি সেই অন্ধকার সিঁড়ির পাশে কেউ গলা টিপে ধরত তো কিছু বলার ছিল না। চিৎকার করলেও বুঝি কেউ টের পেত না। কত সিঁড়ি। ওপরে তাকালে মনে হত আমাকে আকাশে উঠতে হবে, নিচে তাকালে মনে হত পাতালে নামতে হবে। দোতলা না, তেতলা না, সেই চারতলা। রেবতী একদিন গুনেছিল। উঁচু উঁচু ধাপ। পা ধরে যেত সময় সময়। উঁহু, চারতলাও না, আরও চার ছটা ধাপ ডিঙোলে তবে সেই ছাদ লাগোয়া চিলেকোঠার দরজা।

সেখানে পৌঁছে যাবার পর আর যেন তত খারাপ লাগত না। নাকে মুখে একটু খোলা বাতাসের ঠাণ্ডা ঝলক লাগত। বুকটা হাল্কা ঠেকত। হাঁপ ধরা ভাবটা কমে যেত। মনে হত যেন এ যাত্রার মত বেঁচে গেলাম। ঠিক তখনই নিচে আসবার কথা আর মনে হত না।

না, তখন মনে হবার মতন অনেক জিনিস মাথায় ভিড় করে থাকত।

চিলেঘরের দরজার চাবি রেবতীর কাছে থাকত। হাতের ব্যাগ খুলে চাবিটা বার করে, দরজার তালা খুলে ভিতরে ঢুকত। আর ঠিক সেই মুহূর্তে একটা টিকটিকি ডেকে উঠত। রেবতীর বুক ঢিপঢিপ করত। টিকটিকিটা পয়া কি অপয়া বুঝতে পারত না। এই যে এই মাত্র ওটা এমন করে ডাকল তাতে কি বোঝাচ্ছে যে আজ তার রেট মতন দশ টাকা পেয়ে যাবার পর আরও দুটো একটা টাকা বেশি পাবে, না কি ওই দশ পর্যন্ত, তার অতিরিক্ত একটা সিকি আধুলিও না। পাঁচ টাকা তো এখানেই রেখে যেতে হবে। একটু পরে দারোয়ান আসবে। ঠিক বোঝা যেত না, এই যে এখন রেবতী একটা মানুষকে সঙ্গে নিয়ে এ ঘরে ঢুকল দারোয়ান সেটা দেখতে পেল কি পেল না। আহা যদি দেখতে না পেয়ে থাকে, যদি ব্যাটা কোথাও বেরিয়ে গিয়ে থাকে—তা হলে, তা হলে, কতদিন রেবতীর বুকের ভিতর বেলুনের মত একটা আশা দুলে দুলে উঠেছে, কতক্ষণের কাজ বিশ মিনিট, আধঘণ্টা ?—আধঘণ্টার বেশি তো কোন দিনই তাকে সেখানে থাকতে হত না। আবার দরজায় তালা দিয়ে টুকটুক করে নেমে আসত। কাজেই একদিন কি ওই পাঁচটা টাকা ফাঁকি দেওয়া যায় না ? ভাবত সে, আর ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে আশার বেলুনটা ফুটুস করে ফেটে যেত। খড়মের আওয়াজ শোনা যেত। কোনোদিন কাঠের সিঁড়ি বেয়ে ঠকঠক শব্দটা ওপরে উঠে আসত, কোনোদিন ছাদের ওদিক থেকে ক্রমে এদিকে আওয়াজ

ভেসে এসেছে, তারপর খড়মের আওয়াজ কানে আসার ঠিক এক মিনিটের মধ্যেই চোখের সামনে যমের মতন এসে দাঁড়িয়েছে হিন্দুস্থানীটা। কোনদিন যদি তার আসার আগেই রেবতী ভিতরে ঢুকে দরজার ছিটকিনি তুলে দিতে পেরেছে সেদিন রেবতীর বুকের ভিতর বেলুনটা আরও ফুলতে আরম্ভ করত, আজ ঠিক ব্যাটাকে ফাঁকি দেওয়া যাবে। আজ পাঁচটা টাকাই বেঁচে যাবে। তার মানে পুরা দশ টাকা ব্যাগে পুরে রেবতী এখান থেকে বেরোতে পারবে। তাই তো, সবটা টাকাই তো তার, সে উপার্জন করেছে, আধঘণ্টা তিরিশ মিনিটের জন্য না হয় এখানে এসেছে, তা-ও কিনা তেত্রিশটা সিঁড়ি ভেঙে পায়ে ব্যথা ধরিয়ে তবে এই পায়রার টঙে এসে ঢোকা।

কতদিন সে ভেবেছে, কলকাতা শহরে কি এমন একটা নিরিবিলি জায়গা নেই, হুঁ, কোনো গাছতলা ? হোক না মাটি ঘাস, ঘাসের ওপর শুতে—যদি সঙ্গে মেয়ে মানুষ থাকে কোনো পুরুষ আপত্তি করবে বলে রেবতী বিশ্বাস করত না। একটু ঝোপঝাপের আড়াল থাকলেই হল। এমন একটা জায়গা পাওয়া গেলে কেনোদিনই তাকে আর কড়কড়ে পাঁচটা টাকা দারোয়ানের হাতে তুলে দিতে হত না। কিন্তু তা নেই, তা যে ছিল না ওই পোড়া কলকাতা শহরে। কেবল মানুষ, কেবল ঘর বাড়ি, গাড়ি ঘোড়া, কেবল মানুষের চোখ আর চোখ। গড়ের মাঠ, গঙ্গার ধারের কথা রেবতী কেবল কানেই শুনত। তাও তো অন্ধকার না হলে সে সব জায়গায় কাউকে সঙ্গে নিয়ে যাবার উপায় ছিল না। কিন্তু অন্ধকারে কতজন রেহাই পায়নি এ-ও সে শুনত। রাত্রেই পুলিসের উৎপাত বাড়ত। পাঁচ টাকা বলে পাঁচ টাকা, হিড়হিড় করে জোড়া শুদ্ধ টেনে নিয়ে গেছে থানায়। তারপর কত হয়রানি, বিশ ত্রিশ চল্লিশ পঞ্চাশ, সঙ্গে যা আছে সব দাও, নয়তো কানের মাকড়ি হাতের ঘড়ি খুলে রেখে যাও। কাজেই সে সব জায়গায় যাবার কথা রেবতী ভাবতেও পারত না। পাঁচ টাকা হিন্দুস্থানীটাকে ভাগ দিয়ে বাকি পাঁচ টাকা নিজের ভাগে পেলে

সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে। তাছাড়া যখন খুশি এই পায়রার খুপরীতে এসে ঢুকে পড়ো। কেউ কিছু বলবার নেই। পুলিসের বাবারও সাধ্য নেই খুঁজে বের করে, দিন দুপুরেও এই ছাদের ঘরে তুমি কার সঙ্গে কী করছ মাছিটিও টের পেল না।

তাই বাড়িটার ছবি মনে পড়লে রেবতীর এখন হাসি পায়। নিচের সবটা জুড়ে কাঠের দোকান, দোতলায় ডেন্টিস্ট ও চোখের ডাক্তারের চেম্বার, তেতলায় কিসের ইউনিয়ন টিউনিয়ন, সঙ্ঘ সমিতির আপিস, চারতলায় ক ঘর গুজরাটি পার্শি পরিবারের বাস, হিং-এর রান্নার গন্ধ আর কাচ্চাবাচ্চার চেঁচামেচি যখন-তখন টের পাওয়া গেছে। আর বড় বড় কাঠের পাটাতন নিয়ে প্রকাণ্ড সিঁড়ি। কোন্ আমলের বাড়ি কে জানে? এত ছুঁচো আরসোলার গন্ধ।

সেই বাড়িতে প্রথম ভাল লেগেছিল মানুষটিকে।

শেয়ালদার মোড়ে একটা পানের দোকানের সামনে অবশ্য প্রথম-দিন দেখা। সেখানে দাঁড়িয়ে একটু আলাপ। অসুরের মতন এত বড় শরীর। খড়্গের মতন খাড়া একটা নাক। বড় বড় কান। মাথায় ঝাঁকড়া চুল। কেমন ভয় লাগছিল দেখে রেবতীর। তা হলেও খদ্দের। যাকে বলে লক্ষ্মী। অসুর হোক দেবতা হোক, খদ্দের যখন তোমায় চাইছে তুমি তাকে 'না' বলে বিদায় করতে পার না।

কিন্তু প্রথম দিন একটা চায়ের দোকানে ঢুকে একটু চ-টা খাওয়া হল শুধু।

রেবতীর ভয় ভাঙল।

দেখতে দৈত্য হলে হবে কি, মানুষটার স্বভাবটা যেন মধুর মতন মিষ্টি, ভিতরটা নরম। একটু হাত টিপল, গাল টিপল, তারপর দুটো টাকা রেবতীর হাতে গুঁজে দিয়ে দোকান থেকে বেরিয়ে গেল।

পরদিন আবার দেখা সেই পানের দোকানের সামনে। আবার রেবতীকে ডাকল। দুজনে সেই একই চায়ের দোকানে ঢুকল।

সেদিন একটু বেশি সময় ছিল তারা সেখানে।

কেবল চা না, মাংস পরটা অনেক কিছু খেতে হল রেবতীকে। আশ্চর্য, সেদিন কিন্তু মানুষটা একবারও রেবতীর গায়ে হাত দিল না। কেবল কথা বলে গেল। তার দুঃখের কথা, দুর্ভাগ্যের ইতিহাস।

যেন বলতে বলতে মানুষটার চোখে জল এসে গিয়েছিল। অসুরের মতন সেই পুরুষের ভিতরটা যে কত অসহায়, কত দুর্বল— রেবতীর মনে হচ্ছিল তার সামনে একটি শিশু বসে আছে।

রেবতী কথা বলছিল না। কেবল শুনছিল।

যাবার সময় একটা দশ টাকার নোট তার হাতে গুঁজে দিয়ে মানুষটা বেরিয়ে গেল। রেবতী অবাক হয়েছিল। দোকানের সবটা বিল শোধ করেছে, তাতেও বেশ কটা টাকা খরচ হয়েছে, তার ওপর আবার এক সঙ্গে দশ টাকা, যেন বিশ্বাস করতে পারছিল না রেবতী। খুব সঙ্কোচ হচ্ছিল তার হাত বাড়িয়ে টাকাটা নিতে। একটু আপত্তিও করেছিল, কিন্তু কিছুতেই শুনল না, আমি তোমাকে দিলাম, দিতে ভাল লাগল, ব্যস, এর পর আর কথা বলবে? বলে সে অল্প হেসে রেবতীর গালে একটা টোকা দিয়ে দোকান থেকে হন হন করে বেরিয়ে গেল। সত্যি, রেবতী আর একটা কথাও বলতে পারে নি।

কিন্তু তার মনে হতে লাগল, যেন বুকের ভিতর কিছু একটা গুঁজে দিয়ে গেল মানুষটা, হুঁ, মাটির ভিতর মানুষ যেমন বীজ পুঁতে দেয়।

এ কিসের বীজ! এই বীজ ফেটে যদি অঙ্কুর বেরোয় তো রেবতী কি চিনতে পারবে এটা কিসের গাছ! কিছুই বুঝতে পারছিল না। পুরো দু'দিন ধরে কথাটা তার মনে হয়েছে, দৈত্যের মতন চেহারাটা চোখের সামনে ভেসে উঠেছে, সেই সঙ্গে শিশুর মতন দুটো চোখের কাকুতি।

তারপর একটা সপ্তাহ কেটে গেছে।

এর মধ্যে মানুষটাকে একদিনও দেখতে পাওয়া গেল না। যখনই রেবতী রাস্তায় বেরিয়েছে চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে চারদিকে খুঁজেছে।

চোখে পড়েছে কেবল ছোট ছোট মানুষ। এইটুকুন সব আকৃতি। যেন সে বামনের দেশে এসেছে। আশ্চর্য, কোন পুরুষকেই আর পুরুষ বলে ভাবতে তার ইচ্ছা করছিল না। তার মনে হতে লাগল, জীবনে একটি পুরুষই সে দেখেছে—সেই পুরুষ একটুখানি মুখের পরিচয় দিয়ে আবার কোন অজ্ঞাত দেশে চলে গেছে—কোনোদিন আর এই কলকাতার রাস্তায় তাকে দেখা যাবে না।

রেবতীর বুকের ভিতর চিনচিন করছিল।

ঢোক গিলতে গেলে একটা কিছু যেন বুকে ঠেকেছে। তখনই তার মনে পড়েছে কোনো ফুল কি ফলের বীজের মতন সেই আশ্চর্য জিনিসটা।

তার তখন ইচ্ছা করত বমি করে সেই ছোট্ট শক্ত জিনিসটা বুকের ভিতর থেকে বার করে ফেলে, তারপর হাতে নিয়ে পরীক্ষা করে দেখে ওটা সত্যি একটা বীজ কিনা—যদি বীজ হয়ে থাকে তো এই বীজ থেকে কোন গাছ মাথা ফুঁড়ে বেরোবে সে ভাবতে আরম্ভ করত। যেন অনেক রকম গাছ চোখের সামনে দেখতে পেত—কামনার গাছ লোভের গাছ ভালবাসার গাছ, আরো কত কি! রেবতীর হাসি পেত। স্বামী-স্ত্রীর সুখের জীবনকেও যদি একটা গাছ বলে ধরা যায় তো সেই গাছও যেন ডালপাতা মেলে ঠাণ্ডা ছায়া নিয়ে তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে সে দেখতে পেত।

নানা জাতের গাছের ছবি কল্পনা করত রেবতী, তার এত ভাল লাগত, যেন ইচ্ছা হত ঘরে বসে চুপ করে কেবল এসব ছবি দেখে। রাস্তায় বেরোতে একটু ইচ্ছা করত না।

কিন্তু না বেরোলে দিন চলবে কেমন করে। রোজগার না থাকলে খাবে কি। বাধ্য হয়ে রাস্তায় বেরিয়েছে।

সেদিন দুপুরবেলা, কি একটা ছুটির দিন ছিল, রাস্তায় লোকজন কম, গাড়ি ঘোড়ার ভিড় তত ছিল না। ধরমতলার মোড় থেকে রেবতী উত্তর দিক ধরে হাঁটছিল। মাঝপথে একটা সিনেমা

হাউসের দরজার সামনে সে দাঁড়াল। লাইন দিয়ে লোক দাঁড়িয়ে আছে টিকিট কাটবে। দেখার কিছু নেই, রোজই জায়গাটা পার হবার সময় এমন একটা ছুটো লাইন রেবতী দেখতে পায়। সবাই ব্যস্ত থাকে তখন, কতক্ষণে টিকিট কেটে ভিতরে ঢুকে পড়বে। টিকিট ঘরের জানালাটা খুলতে যত দেরি হয় লাইনটা তত লম্বা হতে থাকে। মানুষের ব্যস্ততা বাড়ে। বিরক্তি বাড়ে। ঠেলাঠেলি আরম্ভ হয়। গালিগালাজ। শেষ পর্যন্ত হাতাহাতি। পুলিস ছুটে আসে। সার্জেণ্ট ছুটে আসে। হুমকি ধমক চেঁচামেচি চলে কতক্ষণ। তারপর আবার সব ঠাণ্ডা হয়ে যায়। আবার মানুষগুলি চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। যেন এক সারি ভেড়া, এক সারি ছাগল। মুখে শব্দ নেই। শান্ত স্থির।

দেখার কিছু নেই। তবু দাঁড়িয়ে থেকে রেবতী কতক্ষণ দৃশ্যটা দেখে। না, এসময় কোনো পুরুষ তার দিকে তাকায় না। তাদের দৃষ্টি সিনেমার পোস্টার, টিকিট ঘর।

রোজ যেমন হয়। একটা ছোট নিশ্বাস ফেলে রেবতী সেদিন আবার হাঁটতে আরম্ভ করেছিল। কেউ যেন হঠাৎ তাকে পিছন থেকে ডাকল।

রেবতী চমকে উঠল। ঘাড় ফিরিয়ে দেখল সেই অসুরের মতন পুরুষ। একটা হাত তুলে রেবতীর দিকে চোখ রেখে হাসছে। রেবতীর সর্বাঙ্গ কাঁটা দিয়ে উঠল। হাসবে কি কাঁদবে বুঝতে পারছিল না। ঘুরে স্থির হয়ে দাঁড়াল।

ভারি পা ফেলে মানুষটা তার কাছে চলে এল।

'কোথায় ছিলে ক'দিন?' রেবতীর কাঁধে একটা হাত তুলে দিল পুরুষ। রেবতী কানে মাথায় লাল হয়ে উঠে এদিক ওদিক তাকাল। এত প্রকাশ্য জায়গায় কেউ কোনোদিন তার কাঁধে হাত রাখে নি। রেবতী একটু আলাদা হয়ে দাঁড়াতে চেষ্টা করল। টের পেয়ে মানুষটা শব্দ করে হেসে ফেলল। যেন হেসে রেবতীর সব লজ্জা জড়তা উড়িয়ে দিতে চাইল। তা তো হবেই। এই মানুষটার নিজেরও

লজ্জা সঙ্কোচ ভয়—হুঁ, ভয় বলতেও কিছু নেই যে, শিশুর মতন সরল অবোধ, কাজেই আর একজন কেন লজ্জিত হবে, সঙ্কুচিত হবে তা সে বুঝত কেমন করে। বোঝালেও বুঝবে না যে।

বিব্রত হয়ে রেবতী অন্যকিছু বলার আগে তৎক্ষণাৎ বুদ্ধি করে বলল, 'একটা ট্যাক্সি ডাকলে হয় না?'

তাতে কাজ হল।

তার কাঁধ ছেড়ে দিয়ে মানুষটা ট্যাক্সি ডাকতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

খুঁটিয়ে আজ সব মনে পড়ছিল রেবতীর।

'কি হল, কথা বলছ না যে!' ট্যাক্সিতে উঠে রেবতী প্রথমটায় একটু গম্ভীর হয়েছিল। কাজেই মানুষটা অপ্রস্তুত হয়ে গেল। হঠাৎ যেন আর রেবতীর গলায় হাত দিতে সাহস পেল না। অপরাধীর মত গলার স্বর করে দুবার প্রশ্নটা করল, 'চুপচাপ কেন—আমার ওপর রাগ করেছ?'

এবার রেবতী ঈষৎ হাসল।

'হ্যাঁ, রাগ একটু আছে বৈকি—আমি তো ক'দিনই এই রাস্তায় খোঁজাখুঁজি করেছি—বরং আপনিই কোথায় ডুব দিয়েছিলেন।'

'না না, এসেছি, আরও দুবার আমাকে কলকাতা আসতে হয়েছে। তবে খুব তাড়াহুড়ো করে এসেই কাজ সেরে আবার ফিরে যেতে হয়েছে। কিন্তু তাড়াহুড়ার মধ্যেও তোমাকে খুঁজেছিলাম, অন্তত এদিকে কোথাও দেখতে পাই নি।'

'আমিও কদিন খুব একটা বেরোই নি।' রেবতী এবার স্বীকার করল। পর পর দুদিন খুব খোঁজাখুঁজি করে যখন কোথাও দেখতে পেলাম না তখন মন খারাপ করে আর ঘর থেকে বেরোলাম না।

'আমার জন্য মন খারাপ! সত্যি? আমার জন্য কেউ মন খারাপ করে ভাবতেও কেমন লাগছে।' শিশু চঞ্চল হয়ে উঠল, উচ্ছল হয়ে উঠল। হেসে রেবতীর একটা হাত কোলে টেনে নিল। রেবতী আর বাধা দিল না।

সেদিন সেই ছুঁচোর গন্ধ আরসোলার গন্ধে ভরা কাঠের সিঁড়ি বেয়ে ওপরে ওঠার সময় রেবতী তার বুকের ভিতর ওটা কিসের বীজ লুকোনো আছে চিনতে পারল। আর কোনো সংশয় রইল না তার মনে।

জোয়ান মানুষটার পায়ের দুপদাপ শব্দ হচ্ছিল। সিঁড়িটা থরথর কাঁপছিল। অথচ কত পুরুষকে সঙ্গে নিয়ে রেবতী এই সিঁড়ি বেয়ে তার চিলেকোঠায় উঠে গেছে, কোনদিন সিঁড়ি এমন কাঁপেনি, এত শব্দ হয়নি কারো পায়ের।

তা কেমন করে কাঁপবে, রেবতী এখন হাসে। ওরা তো পুরুষ ছিল না, পুতুল ছিল সব। পুতুল নিয়ে খেলা করে তার কত দিন কেটেছে। তারপর এল এই বিরাট মানুষ। মুকুন্দ। রেবতীর জীবনের প্রথম পুরুষ।

সেদিন দুপুরে বৌবাজারের চিলেঘরে বসে মুকুন্দর চোখের ভিতর রসুলপুরের নীল আকাশ ঝকঝকে রোদ গাছের ছায়া দেখতে পেল রেবতী, পাখির গান শুনতে পেল, ঘাসের গন্ধ ফুলের গন্ধ তার নাকে লাগল। তারা হাতছানি দিয়ে তাকে ডাকছিল।

মুকুন্দ সব বলে গেল। কিছুই গোপন করল না।

'কিন্তু আমি যে বেশ্যা, রাস্তার মেয়ে—আমি তোমার শূন্য ঘর পূরণ করব—করতে পারব এ তুমি আশা করছ কেন।'

মুকুন্দর কপাল থেকে রুক্ষ চুল ক'টা সরিয়ে দিয়ে রেবতী সুন্দর করে হাসল।

মুকুন্দ হাসল না। শিশুর মতন একটা থমথমে অভিমান এতবড় মানুষটাকে আচ্ছন্ন করে ফেলল রেবতী পরিষ্কার দেখতে পেল। একটু চুপ থেকে রেবতী আবার বোঝাল, 'বিয়ে করতে চাইছ, কিন্তু শাস্ত্রে এমন বিয়ের কথা লেখা আছে কি, এ বিয়ে যে কোনদিন শুদ্ধ হয় না।'

চুপ চুপ। যেন রেবতীর মুখে হাত চাপা দেয় মুকুন্দ, এমনভাবে সে

রুখে উঠল, উত্তেজিত হয়ে উঠল। এই প্রথম পুরুষের চোখের আগুন কাকে বলে রেবতী দেখল, জানল। হুঁ, মানুষটার সেই ভয়ঙ্কর মূর্তি মনে হলে রেবতীর ভিতরটা এখনও কাঁপে।

কিন্তু আসলে রেবতীর ওপর কি সে রাগ করেছিল, তার রাগ শাস্ত্রের ওপর সমাজের বিধি নিষেধের ওপর, দুনিয়ার ভাল ভাল সব উপদেশ নির্দেশের ওপর।

গমগম করছিল তার গলার স্বর। যেন বনের হিংস্র বাঘের কাছে লোহার খাঁচার সুখ্যাতি করতে গিয়ে এই বিপদ হল, তাই এত রোষ এত গর্জন।

আমার শাস্ত্র আমার কাছে। আমি অন্য কোন শাস্ত্র মানি না। আর যদি বিয়ের কথাই বল, আমাদের বিয়ে হয়ে গেছে, এই মাত্তর হল। চিলেঘরের সেই চিলতে খাটের বিছানাটা আঙুল দিয়ে দেখিয়ে মুকুন্দ একটা গরম নিশ্বাস ফেলেছিল। যেন দম নিতে একটু সময় চুপ থেকে পরে আবার বলেছিল, মনের বিয়েই হল আসল বিয়ে, আমি তোমাকে ভালবাসি, তুমি আমাকে ভালবাস? তারপর তো আর কোন মন্ত্রপাঠ শাস্ত্রের বচন শোনার দরকার হয় না। হুঁ, রাস্তার মেয়েই আমার ঘরণী হবে, আমার ঘর আলো করবে। অনেক খুঁজেপেতে বাছবিচার করে নৈকষ্য কুলিনের মেয়েকে ঘরে এনেছিল আমার বাবা। পুত্রবধূর লক্ষ্মীশ্রী দেখে বাবা মা দুজনেই আহ্লাদে আত্মহারা হয়েছিল। সেই কুলবতী যদি কুলত্যাগ করতে পারল, কুলটা হতে পারল তো, তুমি যে বলছ বেশ্যা পতিতা—সে-ই বা কেন কুলবধূ হতে পারবে না। একশ বার পারবে, পারবে কিনা বলো?

রেবতীর হাত ধরে ঝাঁকুনি দিয়েছিল মুকুন্দ। রেবতী আঙুলের নখ কামড়াচ্ছিল। ঝাঁকুনি খেয়ে হাতটা মুখ থেকে খসে পড়ল।

তা ছাড়া? তুমি কি তোমার আজকের এই জীবন চেয়েছিলে! তুমি তো চাওনি। তোমার ভাগ্য তোমাকে এমন করেছে, সব তো শুনলাম।

সব বলেছিল রেবতী। কিছুই গোপন করেনি। সেদিন এমন এক পুরুষ তাকে আলিঙ্গনবদ্ধ করেছিল যার কাছে কিছুই গোপন করার ছিল না, হৃদয় উজাড় করে সব কিছু তাকে বলতে হয়েছিল, না বললে অপরাধ হত, পাপ হত, আর অনুশোচনায় ক্ষত-বিক্ষত হয়ে নরক যন্ত্রণা ভোগ করতে হতো তাকে।

রেবতীর চোখে জল এসে গিয়েছিল। মুকুন্দ বলছিল, কাজেই বিয়ে ফিয়ে যা হবার হয়ে গেছে, এখনি হয়ে গেল ধরে নাও। এবার বিয়ে নিয়ে আমরা ভাবব না। আমরা ভাবব আমাদের নতুন জীবন। আমরা নতুন করে বেঁচে উঠেছি।

রেবতীর কপালে আর একটা চুমু এঁকে দিল তার পুরুষ। রেবতীর মনে হল এই তার এয়োতি, এই তার সিঁদুরের ফোঁটা।

অবশ্য এখানে আসার দিন শেয়ালদা থেকে এক প্যাকেট সিঁদুর কিনে দিয়েছিল মুকুন্দ। ট্রেনে অসুবিধা হয়নি। ট্রেন থেকে নেমে তারা যখন গরুর গাড়ি করে আসছিল মুকুন্দ তার কপালে সিঁথিতে ভাল করে সিঁদুর পরিয়ে দেয়।

বলাইকে অবশ্য অন্য রকম বলা হয়েছে। বলতে হয়েছে। রেজিস্টারী করে তাদের বিয়ে হয়েছে। গাঁয়ের মানুষ। মনের বিয়ে হৃদয়ের বন্ধন এসব কথা বলাই রাখাল বুঝত না, পাড়াগাঁর কাউকেই বোঝান যেত না।

৩

যেমন বাইরের উঠোন তেমনি প্রকাণ্ড উঠোন মুকুন্দর অন্দরের।

উঠোনের এক পাশে ডালিম গাছ। ডালিমফুল আর কলিতে গাছটা ছেয়ে আছে।

ফুলের মধু খেতে ভোমরা উড়ে আসে, প্রজাপতি উড়ে আসে।

ওপাশে রান্নাঘরের বেড়া অপরাজিতার ঝোপে ঢেকে গেছে।

বর্ষা আসুক, দেখবে কত বড় অপরাজিতা ফোটে। মুকুন্দ আঙুল দিয়ে দেখায়, আর ঐ যে আমার ধানের মরাইয়ের কাছে যেতে পথের ছুপাশে কত লেবুগাছ। কাগজি গন্ধরাজ।

ফাল্গুন মাস। লেবু ফুলের গন্ধও রেবতীর নাকে আসছিল। ওদিকে আমের বোল সজনে ফুল বেল ফুল। গন্ধে গন্ধে নেশা ধরে যায়।

নেশায় আচ্ছন্ন হয়ে আছে রেবতী, এখানে এসেছে কদিন থেকে।

যেমন উঠোন তেমনি প্রকাণ্ড এক একটা ঘর মুকুন্দর। দক্ষিণমুখো শোবার ঘর। দামি কাঠের বড় বড় দরজা জানলা। ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আকাশ দেখা যায়। আর হু-হু হাওয়া।

তোমার ইচ্ছে হয় পর্দা খাটিয়ে নিও। মুকুন্দ বলল, এতকাল তো আর পর্দা ছিল না।

কিন্তু তার আগে? যখন দিদি ছিল? রেবতী শুধোয়।

মুকুন্দর মুখের চামড়া কুঁচকে ওঠে।

ওমা, তুমি আবার হঠাৎ দিদি বলে বসলে! বলো পিশাচী, শয়তানী। খবরদার, আর কোনদিন দিদি শব্দ উচ্চারণ করবে না!

না, করব না। রেবতী লজ্জা পেয়ে চুপ করে রইল।

হুঁ, পর্দা খাটিয়েছিল মানে? ডবল পর্দা খাটাত দুষ্টু। দামী দামী সব পর্দা আমাকে কিনে আনতে হত কলকাতা থেকে। নীল জমির ওপর সাদা ফুল। সাদা জমির ওপর হলদে ফুল। রঙ বেরঙের নক্সার পর্দা। মুকুন্দ দাঁতে দাঁত ঘষল। আর সেই পর্দার আড়ালে থেকে সায়তানী হাতছানি দিয়ে ডেকেছে তাকে।

কাকে? রেবতী ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন করল। আগের বৌ পালিয়ে গেছে। কুড়ি বছর ঘর করার পর স্বামী সংসার ফেলে রেখে শ্রাবণের এক অন্ধকার রাত্রে চুপি চুপি ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে। এই পর্যন্ত মুকুন্দর মুখে শুনেছে সে, মুকুন্দ আর কিছু বলে নি। রেবতীও জানতে চায় নি। আজ হঠাৎ পর্দা খাটানোর কথায় মুকুন্দ সেই কথায় ফিরে এল।

গোলক মিস্ত্রী। এই লম্বা চওড়া জোয়ান দৈত্যের মতন চেহারা।

বলে, মুকুন্দ হঠাৎ কেমন করে যেন হাসল। হাসল, কিন্তু তার চোখের তারায় আগুন জ্বলছিল রেবতী রক্ষ্য করল।

তোমার চেয়েও জোয়ান? তোমার চেয়েও লম্বা চওড়া পুরুষ হয় নাকি! রেবতী না বলে পারল না।

তা হয় বৈকি, হতে দোষ কি।

তেতোমতন একটা ঢোক গিলল মুকুন্দ।

রেবতী ভাবতে লাগল। যেন কথাটা বিশ্বাস করতে তার কষ্ট হচ্ছিল। হাঁ করে মুকুন্দকে দেখতে লাগল।

তাছাড়া সব পুরুষ সব মেয়ের চোখে সমান না। তুমি দেখছ আমাকে, আমার চেয়ে জোয়ান তাগড়া চেহারা সংসারে দুটি হয় না—বিমলা ভাবত গোলকের মত জবরদস্ত পুরুষ ত্রিসংসারে খুঁজে পাওয়া শক্ত। মুকুন্দ ঘাড় ঘুরিয়ে একটা গরম নিশ্বাস ফেলল।

ছি-ছি-ছি! রেবতীর নাকের ডগা কুঁচকে উঠল। যেন তার থু-থু ফেলতে ইচ্ছা করছিল। স্বামী ছাড়া অন্য কোনো পুরুষকে ভাল লাগে, সুন্দর লাগে যে মেয়ের চোখে, তার নরকেও জায়গা নেই।

মুকুন্দর চোয়ালের মাংস নড়াচড়া করতে লাগল। যেন কিছু সে চিবোচ্ছিল। কিছুই চিবোচ্ছিল না যদিও, চোয়াল শক্ত করে দাঁতে দাঁত ঘষছিল।

তা গোলক মিস্ত্রীর সঙ্গে কোথায় দেখা হল তোমার বউয়ের?

বউ বলবে না, মুকুন্দ আবার রুখে উঠল। কোনদিনই সে আমার বউ ছিল না।

রেবতী চুপ করে রইল।

নতুন পুকুরটা কাটাবার সময় কিছু আম কাঁঠালের গাছ কাটা পড়েছিল। বেশ বড় বড় গাছ। অনেক তক্তা বেরোলো। দেখলাম কখানা চেয়ার টেবিল ও একটা ডবল খাট দিব্যি বানিয়ে ফেলা যায়। করাত বাটালি নিয়ে গোলক মিস্ত্রী এল।

এই খাট গোলকের তৈরি? রেবতী আঙুল দিয়ে দক্ষিণের জানালা ঘেঁষে পাতা বড় খাটটা দেখাল।

মুকুন্দ মাথা নাড়ল।

গোলকের হাতের খাট পুড়িয়ে দিয়েছি। খাট টেবিল চেয়ার সব। মুকুন্দর চোখ দুটো ধক-ধক করে জ্বলছিল। এটা নতুন, তুমি আসবে তাই কলকাতা থেকে অর্ডার দিয়ে ডবল খাট আনিয়েছি।

রেবতী চোখ বড় করে নতুন খাট নতুন বিছানা দেখল। আনলাটাও যেন নতুন, টেবিলটা নতুন।

পুরনো কিছুই রাখিনি। মুকুন্দ আঙুল দিয়ে দেওয়ালে ঝুলান বড় আরশিটা দেখাল। তুমি মুখ দেখবে তাই ওটাও কেনা হয়েছে।

অনেক কিছুই কিনে এনেছে মুকুন্দ। পশ্চিমের জানালার কাছে একটা টেবিল বোঝাই হয়ে আছে স্নো ক্রিম পাউডার আলতা সাবান এসেন্সে। চুলের কাঁটা চিরুনী ফিতা।

তুমি আমাকে যেদিন কথা দিলে—তার পরদিন আবার আমি কলকাতা ছুটে গিয়ে সব নিয়ে এসেছি।

তাই দেখছি। রেবতীর চোখের পলক পড়ছিল না। জিনিস দেখে যত না সে আবাক হচ্ছিল তার চেয়ে বেশি মুগ্ধ অভিভূত করল তাকে মানুষটার উৎসাহ আবেগ নিষ্ঠা। তাই তো, বউয়ের জন্য মুকুন্দ না করতে পারে কী। তা-ও তো রেবতী তার বিয়ে করা বউ নয়। নিশ্চয় সেই বউকে, বিমলাকে—পর্দার আড়ালে থেকে লুকিয়ে লুকিয়ে হাতছানি দিয়ে কাঠের মিস্ত্রীকে যে ডাকত, এমন আদর করত মুকুন্দ, আর কত কি না তাকে এনে দিত।

কিন্তু ভালবাসা কজন বোঝে, এ জিনিস চেনার ক্ষমা আছে ক'টা মেয়ের—মেয়ে পুরুষ সকলের বেলায় কথাটা খাটে।

চিন্তা করে রেবতী একটা গাঢ় নিশ্বাস ফেলল।

কেমন হয়েছে জিনিসটা? ছিপি খুলে হেয়ার অয়েলের শিশিটা রেবতীর নাকের কাছে তুলে ধরল মুকুন্দ।

রেবতী চোখ বুজে বুক ভরে মাথায় তেলের সুঘ্রাণ নিল।

চমৎকার। কত দাম নিলে?

দাম শুনে তুমি করবে কি? ছিপি বন্ধ করে মুকুন্দ শিশিটা টেবিলে তুলে রাখল।

তাই তো, রেবতী মনে মনে বলল, জিনিসের দাম দিয়ে কি ভালবাসার বিচার হয়। আর এই পুরুষ যে এইটুকুন ভালবাসার জন্য এত এত দাম দিতে পারে তা কি মানুষটার চোখ দেখে রেবতী বুঝতে পারে না। সেদিনই বুঝতে পেরেছিল। যেদিন সে তাকে ধরল না, ছুঁল না। দশ টাকার একটা নোট হাতে গুঁজে দিয়ে চায়ের দোকান থেকে বেরিয়ে গেল।

ওটা টেনে আন। আঙ্গুল দিয়ে মুকুন্দ খাটের নীচে টিনের বাক্সটা দেখাল।

রেবতী বাক্সটা টেনে বার করল।

এই নাও চাবি, খোলো।

মুকুন্দর হাত থেকে চাবি নিয়ে রেবতী তালা খুলল। এবার মুকুন্দ নুয়ে বাক্সের ডালাটা তুলে ধরল।

ছ্যাখো, কি আছে ভেতরে।

অনেক কিছুই আছে। শাড়ি সায়া ব্লাউজ ব্রেসিয়ার। মুকুন্দ টেনে টেনে সব বার করল।

নতুন?

সব নতুন, মুকুন্দ মোলায়েম করে হাসল। সব সেদিনের কেনা। এটা নাইলন, এটা টেরেলিন, ওটা ডেকরন, এটা সিল্ক। ওটা বেনারসী, এটা মুর্শিদাবাদী, ওটা কাঞ্জিভরম।

একটা ব্লাউজ হাতে নিয়ে নেড়েচেড়ে দেখল রেবতী।

হুঁ, তোমার গায়ে ফিট করবে। মুকুন্দ আর একটু ঝুঁকে দাঁড়াল। পরে ছ্যাখো।

পরতে হবে না। রেবতী লাজুক হাসি হাসল। দেখে বোঝা যাচ্ছে আমার মাপের।

আহা, পরতে তো তোমায় এক সময় হবেই, ছাখো ব্রেসিয়ারটা কি সুন্দর হয়েছে। এসো, আমি পরিয়ে দিচ্ছি, কেমন খাপ খেয়ে লেগে যাচ্ছে, অবাক হবে।

ঠিক আছে, এখন থাক। এই বয়সেও রেবতীকে কুমারী কিশোরীর মতন লাল হয়ে উঠতে হল।

আমার চোখের আন্দাজ, বুঝেছ, একদিন যাকে দেখেছি, একবার যাকে ছুঁয়েছি, সঙ্গে সঙ্গে তার কোমর বুক পাছা মুখস্থ হয়ে গেল। মাপের একচুল নড়চড় হবে না—তা হলে বৌবাজারের সেই বাড়িতে বসে আমাদের মধ্যে যেদিন সব ঠিক হয়ে গেল, পরদিন দোকানে গিয়ে তোমার গায়ের ব্লাউজ বলো, সায়া বলো, কাঁচুলি বলো, মাপসই প্রত্যেকটা জিনিস আমি আনলাম কি করে।

তুমি অদ্ভুত। রেবতী এর বেশি কিছু বলতে পারল না।

আর মুকুন্দ তখন পাঁচ বছরের একটি শিশুর মতন আহ্লাদে ডগমগ হয়ে রেবতীর গলায় মুখে চুমু খেতে লাগল।

একসময় ঝড়টা থামল, মুকুন্দ শান্ত হল, বুকের আঁচল মাথার চুল ঠিক করে নিয়ে রেবতী সোজা হয়ে বসল।

তাই দেখছি, আয়না চিরুনি থেকে আরম্ভ করে সব নতুন করে কেনা হয়েছে, আগের মানুষটার কোনো জিনিস আর নেই ?

সব পুড়িয়ে দিয়েছি—মুকুন্দর দু চোখ আবার জ্বলে উঠল। তার কোন চিহ্ন এ ঘরে রাখি নি। এক কাপড়ে বেরিয়ে গিয়েছিল, কাজেই চুলের ফিতা থেকে আরম্ভ করে শাড়ি সায়া অনেক কিছু আলনায় ঝুলছিল, বাক্সেও থেকে গিয়েছিল কিছু, আমি একটা একটা করে দেশালাইর কাঠি জ্বেলে শেষ করেছি।

রেবতী চুপ থেকে শুনছিল।

হুঁ, যেমন গোলকের হাতের তৈরী খাট টেবিল চেয়ারগুলো

পুড়িয়ে দিয়েছি। পাপীর জিনিস পাপিনীর জিনিস এঘরে থাকলে আমি যে কিছুতেই শান্তি পেতাম না, মাথার ভিতর দাউ দাউ করে আগুন জ্বলত।

ভাল করেছ। রেবতী চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ঘরের ভিতরটা দেখছিল। ওদিকের ওই কাঠের সিন্দুকটার ভেতর কি?

কিছু না, মুকুন্দ জোরে মাথা ঝাঁকাল। বিমলার কোন জিনিস ওতে নেই, থাকলে পুড়িয়ে দিতাম। ওটা আমার মায়ের আমলের পাথরের বাটি থালা গেলাসে বোঝাই হয়ে আছে। সন্দেশের ছাঁচও আছে হরেক রকমের। মুকুন্দ হাসল। পাথরের বাসনের খুব শখ ছিল মার, দেখলেই কিনত, ফি বছর শীতের সময় পশ্চিমা-ফেরিওয়ালারা মাথায় করে এসব নিয়ে আসত।

তাই না কি? রেবতী চোখ বড় করল। আমারও পাথরের জিনিসের খুব শখ। একদিন তো দেখতে হয়।

দেখবে, নিশ্চয় দেখবে। এসব তো এখন তোমারই। মুকুন্দ বলল। চাবিটা এখন সঙ্গে নেই—বলাইদার কাছে।

কেন, বলাইর কাছে তোমার মার সিন্দুকের চাবি কেন! অবাক হয়ে গিয়ে রেবতী হাসল। ও, পুরোনো চাকর, বিশ্বাসী মানুষ—তাই বুঝি কিছু কিছু চাবি তার কাছে থাকে? মুকুন্দ মাথা নাড়ল। সব বাক্স পেটরার চাবিই বলাইদার জিম্মায় থাকে। এ্যাদ্দিন ছিল। আমিই রেখে দিয়েছিলাম। একটু থেমে থেকে, যেন একটু ভেবে নিয়ে মুকুন্দ একটা লম্বা নিশ্বাস ফেলল। এতকাল তো আর ঘরে কেউ ছিল না! আমাকে এখানে ওখানে ছুটোছুটি করতে হয়েছে, কলকাতা যেতে হয়েছে হপ্তায় হপ্তায়। সঙ্গে চাবির ছড়া নিয়ে ঘুরব, কোথায় ফেলে আসি হারিয়ে ফেলি, কাজেই—

রেবতী কথা বলল না।

মুকুন্দ বলল, এখন তুমি এসেছ, আর চিন্তা নেই, তোমার কাছে চাবির ছড়া থাকবে। বলাইদার কাছ থেকে সব চাবি

চেয়ে নেব। এই বাক্সের চাবিও তার কাছে ছিল। আজ সকালে চেয়ে এনেছি।

রেবতী আড়চোখে তার জন্য কিনে আনা শাড়ি জামা বোঝাই টিনের ট্রাঙ্কটা আর একবার দেখল।

নাও, চাবিটা আঁচলে বেঁধে ফেল।

রেবতী আঁচলে বাঁধল না। চাবিটা হাতে রাখল। লক্ষ্য করে মুকুন্দ হাসল, ত্যাখো, আমিও কেমন, আজকালকার মেয়েরা কি আঁচলে চাবি রাখে। আমার মা মাসীরা তাই রাখত, এতবড় চাবির ছড়া আঁচলে বেঁধে ঘুরত।

রেবতীও হাসল, কিন্তু তার চোখ ছিল কোণার দিকে আলনার পিছনে।

ওখানে যেন আর একটা বড় তোরঙ্গ দেখা যাচ্ছে?

হুঁ, রেবতীর আঙ্গুল অনুসরণ করে মুকুন্দ সেদিকে চোখ ফেরাল। ওটার মধ্যে পুরনো তামা কাঁসা। এখন আর ওসব বাসন ব্যবহার করা হয় না। বাবা মা যতদিন জীবিত ছিল, ব্যবহার করা হয়েছে।

বিমলা ব্যবহার করত না? ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু তবু যেন রেবতী না বলে পারল না।

মুকুন্দ সরে গিয়ে জানালা গলিয়ে থুথু ফেলে এল।

করেছে, আগে আগে দু একখানা বাসন যে ব্যবহার না করেছে তা নয়, কিন্তু পরে যখন মানুষটাকে বুঝে গেলাম তার চরিত্রটা জানা হয়ে গেল তখন আর মা-বাবার জিনিস তাকে ব্যবহার করতে দিইনি। সব বাক্সে তুলে রাখলাম। কলাই করা লোহার থালা বাটি ব্যবহার করেছে, কাচের গেলাস ব্যবহার করেছে। একটা কাঁসার বাটিও নিজে কিনেছিল। চলে যাবার পর বাটিটা ছুঁড়ে আমি পুকুরে ফেলে দিয়েছি।

ওটাও মনে হয় তালাবন্ধ?

হুঁ, মুকুন্দ আবার আলনার ওদিকে চোখ রাখল। চাবিটা বলাইদার কাছে রয়েছে। এক সময় চেয়ে এনে দেব—খুলে দেখবে কত দামী, কত পুরানো কাঁসার বাসন—একেবারে খাঁটি জিনিস—এখন আর এসব জিনিস বাজারে দেখতে পাওয়া যায় না।

পুরনো সব কিছুই ভাল। রেবতী মলিন হাসল। যেমন আগের দিনের কাঠের জিনিস, পাথরের জিনিস।

হুঁ, তা বটে। মুকুন্দ মাথা নেড়ে সায় দিল। আজকাল অনেক কিছু মেকী ভেজাল জিনিস বেরিয়েছে।

আলনার পিছনে কালো বড় তোরঙ্গটার দিকে আর একবার চোখ বুলিয়ে রেবতী মুকুন্দর দিকে মুখ ফেরাল।

না, পর্দার কথা বলছিলে, পর্দা খাটাবার দরকার কি। পর্দা ছাড়াই তো ভাল। হাওয়া আসে, ঘরে রোদ আসে।

আমারও সেই কথা। যে মানুষ ভাল থাকে সুন্দর থাকে খাঁটি থাকে পর্দার বাইরেও সে খাঁটি থাকে সুন্দর থাকে। আর যার খারাপ স্বভাব—মুকুন্দ নতুন করে উত্তেজিত হয়ে উঠল, নিজে থেকে ঘর থেকে বেরোতো না বলে আমি যখনই যেখানে বেড়াতে গেছি সঙ্গে নিয়ে গেছি, শিকারে গেছি তো আমার সঙ্গে গেছে—এই নিয়ে লোকে আড়ালে কত কি বলাবলি করেছে—হুঁ, আমি বৌ-নেওটা, বৌ ছাড়া আর কিছু চিনি না, বৌকে মাথায় তুলে নাচি—

বলুক। লোকের কথায় কিছু এসে যায় না, অনেক কিছুই মানুষ বলে। রেবতী সান্ত্বনার গলায় বলল, তুমি তোমার কর্তব্য করেছ। কিন্তু দুঃখ হয়, যাকে নিয়ে এত কথা, যার জন্য এত করলে, এত যাকে ভালবাসলে, সেই মানুষ কিনা—

বয়ে গেছে। যেন আবার থুথু ফেলতে মুকুন্দ জানলায় ছুটে যেতে চেয়েছিল। কিন্তু তা আর গেল না, দাঁড়িয়ে থেকে মুখটা বিকৃত করে ফেলল। এই জন্য আমি গলায় দড়ি দিয়েছি বিষ

খেয়েছি আগুনে ঝাঁপ দিয়েছি কিনা। মুখে কালি মেখে তুই ঘর থেকে বেরিয়ে গেলি, তাতে আমার কী হল। আমি যে-মুকুন্দ সেই মুকুন্দ আছি—না, তোর মতন বৌ গেছে বলে আমি আর বৌ পাব না, মেয়েছেলে পাব না? বরং ভালই হয়েছে, দুষ্ট গরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ঢের ভাল।

এখন কিন্তু আর গোয়াল শূন্য নেই। কালো চোখে টলটলে হাসি নিয়ে রেবতী মুকুন্দর হাত ধরল।

না না নেই। মুকুন্দ নতুন বৌকে জড়িয়ে ধরল। কালো চোখের একটি ঠাণ্ডা মিষ্টি গাই আমি ধরে এনেছি। পেট ভরে এখন দুধ খেতে পারব আর নাক ডেকে ঘুমোব।

দূরে বনে একটা কোকিল ডেকে উঠল। তাইতো, শূন্য ঘরে শূন্য বিছানায় মুকুন্দকে কত অনিদ্রায় রাত কাটাতে হয়েছে।

ঈশ্বর আছে। কথাটা এখন বিশ্বাস করতে ইচ্ছা করছে রেবতীর। তা না হলে ঈশ্বরকে সে একদিন মনে মনে কত ডেকেছিল, কিন্তু তার আকাশ তেমনি শুকনো খটখটে থাকত, মাথায় রৌদ্র ভেঙ্গে পড়ত। এক ফোঁটা মেঘ দেখা যেত না।

সেই রৌদ্রের দুপুরে কপালে ঘাম নিয়ে বৌবাজার শেয়ালদা ধর্মতলার রাস্তায় হেঁটে হেঁটে পায়ে ব্যথা ধরে যেত।

তারপর ভাবত, ঈশ্বর নেই। আর তো সুদিন আসে না। সুযোগ আসে না। কোনদিন আসবে রেবতী আশা ছেড়ে দিয়েছিল। কিন্তু আজ ঠিক এসেছে।

সুদিনের দেখা সে পেয়েছে। আজ অফুরন্ত রোদ নিয়ে, কখনো কালো এক আঁজলা মেঘ নিয়ে তার দিন হাসছে। ঝকঝকে তারা নিয়ে অন্ধকার নিয়ে কখনো চাঁদের আলো নিয়ে তার রাত হাসছে। দিন যত সুন্দর রাত তত সুন্দর। এ সুখের তুলনা হয় না!

ফ্রেমে বাঁধানো কত বড় একটা আরসি! হাতের মুঠোয় ধরে না এতবড় একটা হাড়ের চিরুণী। রেবতীর মাথার চুলের মতন কালো কুচকুচে রং সুন্দর চিরুণীটার।

দক্ষিণের জানালায় দাঁড়িয়ে আরসি সামনে রেখে সে চুল আঁচড়ায় আর সেদিনের এক একটা ছবি তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

সাড়ে ছ'আনা দাম, পিছনে টিন দিয়ে মোড়া এইটুকুন একটা আয়না। তাও আবার মাঝখানে ফাটা। মুখটা দু টুকরো হয়ে ফুটে উঠত সামনে ধরলে। কিন্তু উপায় কি, মুখের ওপরের আধখানার ওপর চোখ রেখে রেবতী চুল ঠিক করেছে, চোখে কাজল বুলিয়েছে। কাজল পরা হয়ে যাবার পর নিচের আধখানার ওপর চোখ রেখে গালে পাউডার ঘষেছে, ঠোঁটে রং লাগিয়েছে।

আগে আগে ঠোঁটে রং লাগাত না।

পরে লাগাতে হয়েছে। উপায় ছিল না। যেমন প্রথম প্রথম রাস্তায় বেরোলে আঁচলটা পিঠে ঘুরিয়ে বুকের ওপর টেনে দিত।

কিন্তু পরে তেমন করে বেরোনো চলত না। পিঠ বুক খুলে মেলে তাকে চলতে হয়েছে। দেখতে দেখতে দিনকাল অন্যরকম হয়ে গেল, মানুষের চোখ অন্যরকম হয়ে গেল। কাজেই দিনের সঙ্গে, মানুষের চোখের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলতে হয়েছে রেবতীকে। না হলে তাকে উপবাসে মরতে হয়।

কথাগুলি মনে হলে আজ তার হাসি পায়, দুঃখও লাগে।

সাজ পোশাক বলতে তো একটা পুরনো ঢাকাই শাড়ি আর ফিকে হয়ে আসা একটা লাল সিল্কের ব্লাউজ।

ব্লাউজের রং ফিকে হয়ে যাচ্ছে, শাড়ির রং জ্বলে যাচ্ছে। রেবতীর বয়স বাড়ছে। কিন্তু মন? দৃষ্টি? হাসি?

সব নতুন রাখতে হত, তাজা রাখতে হত। জোর করে হাসতে হত তাকে। লোকের চলায় বলায় নতুন ঢং ফুটিয়ে তুলতে হত। তা না হলে যে ভাতের অভাবে মরতে হত রেবতীকে। হাবুলকে না খেয়ে মরতে হত।

তুই কি এখনি বেরোবি মা?

হুঁ।

হাবুল কোথা থেকে একটা কাঁচা আমড়া জোগাড় করে নুন মাখিয়ে কামড়ে কামড়ে খাচ্ছিল। মার কথা শুনে তার আমড়া খাওয়া থেমে গিয়েছিল। টলটলে চোখ দুটো মেলে ধরে সাত বছরের শিশু কী যেন ভাবছিল।

তুই তো দিনের বেলা বেরোতিস না মা?

রেবতী চুপ থেকে হাত দিয়ে খোঁপাটা চেপে চেপে ঠিক করছিল।

সেই সন্ধ্যেবাতি লাগলে বেরোতিস আর রাত করে ফিরতিস। তাই না মা? হাবুল আবার সব প্রশ্ন করছিল।

হুঁ। প্ল্যাস্টিকের কাঁটা ও প্রজাপতিটা খোঁপায় গুঁজতে গুঁজতে

রেবতীও আবার ফাটা আরসির সামনে দাঁড়িয়ে ছিল। ঘরে থাকবি, আমি সকাল সকাল ফিরে আসব। ছেলেকে উপদেশ দিচ্ছিল সে।

দিনের বেলা মা সেজে গুজে রাস্তায় বেরোচ্ছে। কেমন হাসি পাচ্ছিল হাবুলের। ফিক করে হেসে ফেলল। থাকব ঘরে, আজ আমায় কিন্তু চারটে পয়সা দিয়ে যেতে হবে।

কেন রে, আরসির মধ্যে ঠোঁট টিপে হাসছিল রেবতী। যেন ছেলের সঙ্গে কথা বলছিল না, রাস্তার কোন নতুন খদ্দেরের সঙ্গে কথা বলছিল, সেভাবে ঠোঁট টিপে হাসছিল। তাই হচ্ছিল অবশ্য কদিন ধরে। যদি ঘরেও থাকত রেবতী, যেমন কলতলায় বসে সাবান মাখছে কি পায়খানায় গিয়ে বসেছে, নিজের মনে হাসত সে, নিজের সঙ্গে নতুন ভাবে কথা বলার মহড়া দিত। আগের কালের হাসি আগের কালের কথার ঢং দেখে যে পুরুষ আর মজতে চাইছিল না।

তুই অমন করে নিজে নিজে হাসছিস যে বড়? ছেলে ফের প্রশ্ন করেছিল। তখন রেবতী ছেলের দিকে ঘাড় ফিরিয়েছিল।

এমনি। চার পয়সা দিয়ে করবি কি?

দু পয়সার মুড়ি-মুড়কি আর দু পয়সার—

বল, চুপ করে গেলি কেন? রেবতী ছেলের থুতনি ধরেছিল।

দু পয়সার টোপা কুল।

অত টক খাসনি। রেবতী ছেলের থুতনি ছেড়ে দিয়ে দেওয়ালের পেরেকে ঝুলান বটুয়াটা নিতে হাত বাড়াচ্ছিল। দেব চার পয়সা—কিন্তু রাস্তায় বেরবে না।

হাবুল ঘাড় কাত করেছে। বটুয়া খুলে রেবতী ছেলের হাতে পয়সা দিয়েছে। হাবুল খুশি।

তুই কখন ফিরবি মা?

কেন? যেন ঈষৎ রুষ্ট হয়েছিল রেবতী। ওবেলার জন্য রুটি

তরকারী তোলা আছে। যদি সন্ধ্যেবাতি লাগে, যদি আমি না ফিরি, যদি তোর ঘুম পায় খিদে পায়, খেয়ে শুয়ে পড়বি, কেমন?

হাবুল আর একবার ঘাড় কাত করেছিল।

রেবতী আর কথা বলেনি। দেওয়ালের আর একটা পেরেকে ঝুলান কালীর ফটোটার ওপর চোখ রেখে মাথাটা একটু নুইয়ে তারপর আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিল। মার সঙ্গে সঙ্গে হাবুল মোড় পর্যন্ত ছুটে এসেছিল।

ঘরে ফিরে যা—ঘরে ফিরে যা—রেবতী বার বার বলেছিল। হাবুল শোনেনি। বড় রাস্তা অবধি মার সঙ্গে সঙ্গে ছুটে না এলে কোনদিন সে আর ফিরত না।

বড় রাস্তায় উঠে রেবতী থমকে দাঁড়াত। এবার ধমকের গলায় বলত, যাও—এখন ফিরে যাও।

তোর সঙ্গে যাব। হাবুল নতুন করে বায়না ধরত।

কোথায় যাবি? রেবতী জোরে ধমক দিত।

বেড়াতে।

আমি কি বেড়াতে যাচ্ছি? রেবতী আর দাঁড়াত না। হাঁটতে আরম্ভ করত। হাবুল দাঁড়িয়ে থাকত। ফ্যালফ্যাল করে মাকে দেখত। যেন মায়ের রং দেখছিল সে। ফরসা ধবধবে। রেবতীর নাক মোটা, হাবুলের নাক সরু। বাবার নাক পেয়েছিল। বাবার গায়ের ময়লা রং পেয়েছিল সে।

যা, ঘরে ফিরে যা। ঘাড় ফিরিয়ে আর একবার রেবতীকে চেঁচাতে হত, আর একবার ছেলের মুখটা দেখে রেবতী জোরে জোরে হাঁটত। চোখ দুটো ছলছল করত। কিন্তু জোর করে চোখ শুকনো রাখতে গিয়ে বড় করে তাকে ঢোক গিলতে হত, আর তাতে চেহারাটা এমন বিকৃত হয়ে উঠত যে ভয় পেয়ে যেত সে, কেন না নিজের চেহারা সম্বন্ধে রেবতী এদিকে এতবেশি সচেতন হয়ে উঠেছিল যে একটুতে সে বুঝে যেত কখন তাকে খারাপ দেখাচ্ছে, কখন ভাল লাগছে।

আরসি ছাড়াই রেবতী বুঝতে পারত। হয়তো রাস্তায় যে মানুষগুলি হাঁটত তাদের দেখে তার আরসির কাজ হত। হয়তো তাদের চোখ দেখে দেখে রেবতী নিজের নাক চোখ ভুরু ঠোঁট এত বেশি চিনে গিয়েছিল। পাছে রাস্তায় এমন একটা আরসির মধ্যে বিকৃত চেহারাটা ধরা পড়ে ভয়ে রেবতী সঙ্গে সঙ্গে ঠোঁট টিপে হাসতে আরম্ভ করত। বাড়িতে বাসন মাজতে বসে কি পায়খানায় বসে যেমন নিজের মনে হাসত। কেন না এ রকম আয়নায় তবু তার চেহারাটা ভাল দেখাত। রেবতীর তাই ধারণা হয়ে গিয়েছিল।

তার কারণ অবশ্য ছিল। কদিন আগে মৌলালীর মোড়ে পানের দোকানের সামনে মানুষটা দাঁড়ায়। অল্প বয়স। চোখে চশমা। মাথায় কদম ছাঁট চুল। ছিপছিপে গড়ন। পুরুষের গড়ন দেখে তখন আর খদ্দের বাছাই করার দিন ছিল না তার। কাজেই ওই দুঃখ বুকে চেপে একটু একটু করে সে পানের দোকানটার দিকে এগিয়ে গিয়েছিল। হুঁ, পান খাবে সে। জর্দা পান। মুখ নামিয়ে রেবতী বটুয়া হাতড়ে পয়সা বার করছিল, কিন্তু একটা চোখ ট্যারা করে সার্ট প্যান্ট পরা ছোকরা বয়সের পুরুষকে দেখছিল।

পয়সা খুঁজতে বেশ কিছুটা সময় ব্যয় করেছিল রেবতী।

ইচ্ছা করে ওটা করেছিল। কেননা পান সিগারেট কেনার পরেও যদি লোকটা দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে থাকে আর চোখ ট্যারা করে পাশে দাঁড়ানো একটি মেয়েছেলেকে দেখে ঘন ঘন ঢোঁক গিলতে থাকে, তখন কাজটা কিছুটা সহজ হয়ে যেত। রেবতীর পক্ষে আর একটু এগোন সম্ভব হত। সে দিন তাই হয়েছিল। যখন থলে থেকে পয়সা বার করে রেবতী মুখ তুলেছিল তখন সেই ছোঁড়া পানের দোকানে সাজিয়ে রাখা সাবানটা তেলটা দাম করছিল। ছেলের ধরন ধারণ দেখে রেবতীর এমন হাসি পেয়েছিল। পানের খিলিটা মুখে পুরে চুলের খোঁপাটা দু আঙ্গুলে চেপে ধরে রেবতী এবার

ঠোঁট টিপে হেসেছিল ও সরাসরি তার মুখের দিকে তাকিয়েছিল। বাস কাজ হয়ে গেল।

তাই ভাবে রেবতী। কটা বছরের মধ্যে ওই একটা দিন তার ভাল কেটেছিল। না, সেই ছোঁড়া তাকে আর ছাড়তে চায় না। হুঁ, বিশ ত্রিশ টাকা খরচ করে ফেলল। রেস্টুরেণ্টে বসে মাংস পরটা খাওয়া হল, দুজনে মিলে গঙ্গার ধারে বেড়ানো হল সিনেমা দেখা হল, তারপর—তারপর রাত সাড়ে নটায় ট্যাক্সী করে খদ্দেরকে নিয়ে তার বৌবাজারের সেই চিলে ঘরে চলে গিয়েছিল। আসল ঘটনা সেখানেই ঘটে। ছোঁড়া হুট করে বলে বসল, তোমায় নিয়ে আমি ঘর বাঁধব। রেবতী অবশ্য লাজুক লাজুক চেহারা নিয়ে উত্তর করেছে, তা না হয় বাঁধবেন ঘর, একদিনের সুখ দিয়ে তো আর মানুষকে বিদায় করা যায় না। দু দিন তিন দিন মেলামেশা কাজকারবার করে দেখুন—তখন মন ঠিক করবেন। তখন যদি—ভুল উত্তর দিয়েছিল কি রেবতী? না, ঠিকই বলেছিল সে। কারণ এমন ঘটনা, এসব কথা রেবতীর কাছে নতুন কিছু ছিল না। এক ঘণ্টার সুখ এক সন্ধ্যার সোহাগে গলে গিয়ে কতজন এমন ঘর বাঁধবার কথা তোলে, তুলেছিল যে তার কিছু লেখাজোখা ছিল না। কেন না রেবতী জানত, এই ঘর বাঁধার কথাগুলি ঝুরঝুরে ক'মুঠ বালি ছাড়া আর কিছু নয়। তার কারণ পরদিন আবার ঠিক ঠিক সময়ে—জায়গা মতন—অর্থাৎ যেখানে পুরুষটির অপেক্ষা করার কথা, রেবতী এতবড় একটা আশা বুকে নিয়ে ছুটে গেছে—ঘণ্টার পর ঘণ্টা সেখানে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করেছে—কিন্তু আসেনি, কোনদিন কোন পুরুষকে আর আসতে দেখল না। কাজেই সেদিনের সেই ছোঁড়াকে যে পরদিন গিয়ে পাওয়া যাবে না রেবতী জানত।

না, দুঃখ এই জন্য না, বরং ঐ একটা সন্ধ্যার অশান্তি রেবতীর বুকে অনেক দিন জেগে ছিল। পরদিন গিয়ে ছেলেটির দেখা সে পায়নি। বৈঠকখানা বাজারের মোড়ে তার অপেক্ষা করার কথা ছিল। তার

কষ্ট হচ্ছিল একটা অন্ধ গোছের পুরুষকে ঠোঁট টেপা হাসি দেখিয়ে কেমন হাতের মুঠোয় সে এনে ফেলেছিল। আর তো তেমন করে কাউকে পারছিল না। এর আগে এর পরে কত মুখের দিকে তাকিয়ে ঠোঁট টিপে সে হেসেছে। না, সেদিনের মতন কেউ দু হাতে এত টাকা খরচ করল না। এমন করে জড়িয়ে ধরে কেউ হা হুতাশ করল না। রেবতী যেমন ব্যবসা করতে নেমেছিল—ওরাও, মানে পুরুষেরাও সেই চোখ সেই মন নিয়ে দু এক ঘণ্টার জন্য ভালবাসতে ভালবাসা পেতে কাছে আসত। পয়সা দেবার বেলায়ও তেমনি। একটা আধলা কেউ বেশি দেবে না। যা রেট আছে তাই দেবে—যেমন রিক্সা চড়ে রেট অনুযায়ী কলকাতার মানুষ পকেট থেকে পয়সা গুণে বার করে, যেমন ট্যাক্সি করে জায়গা মতন পৌঁছে মিটার দেখে বাবুরা টাকা বার করে—রেবতীর বেলায়ও তাই।

কাজেই বৌবাজারের সেই চিলেঘরে ঘণ্টা গুণে ভাড়া দিয়ে দিয়ে তার নিজের থাকতই বা কত।

অল্প বয়সের ছোঁড়া। রেবতী পরে মনে মনে হেসেছে। দুঃখটা তার খামকা। চল্লিশ ছুঁই ছুঁই করছিল তার বয়স। উনিশ কুড়ি বছরের ছেলে তার কাছে ভিড়বেই বা কেন। নিশ্চয় সেদিন রাস্তায় আর কোনো মেয়েকে দেখতে পায় নি। অথবা এমন হতে পারে, মেয়েছেলের গা শুঁকতে সবে আরম্ভ করেছিল ছোঁড়া। তাই রেবতীকে প্রথম দিন পেয়েই—

পরদিন হয়তো ওই পানের দোকানটার সামনেই বীণা শোভা হাসি কি যমুনাকে পেয়ে গিয়েছিল।

রেবতীর দুঃখ ছিল সেইখানে। দেখতে দেখতে এই দু' তিনটা বছরের মধ্যে কোথা থেকে কাঁচা বয়স নরম শরীর নিয়ে গুচ্ছের মেয়ে এসে রাস্তায় বাজারে ভিড় করতে আরম্ভ করেছিল। যেন এসেই ওরা বাজারটাকে হাতের মুঠোয় তুলে নিয়েছিল। রেবতী সুবিধা করতে পারছিল না। কাজেই রোজ তাকে জায়গা বদল করতে হত।

শেয়ালদার মোড় ছেড়ে মৌলালীর মোড়ে চলে গেছে সে, সেখান থেকে ধরমতলা, ধরমতলায় সুবিধে করতে না পেরে ওয়েলিংটন ধরে কলেজ স্ট্রীটের দিকে এগিয়ে গেছে—কিন্তু সব জায়গায় এক অবস্থা। কাঁচা বয়স নরম শরীর টলটলে চোখ আঁটো বেণী লাল ঠোঁট। কার সাধ্য ওদের জন্য একটা কুটো দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরত রেবতী। সন্ধ্যা না হতে ওরা ঝাঁক বেঁধে রাস্তায় নামত। তাই অনেক দুঃখে অনেক দেখে শুনে রেবতী শেষটায় দুপুরে দুপুরে বেরোতে আরম্ভ করেছিল। কিছুটা ফল পাওয়া গেল। একটু বেশি দর কষাকষি করে, একটু দূরের মানুষ ওরা—কিন্তু তা হলেও সন্ধ্যাবেলা বেরিয়ে কদিন রেবতীকে যেমন শূন্য হাতে ঘরে ফিরতে হত, তেমনটা আর হত না।

মফঃস্বলের মানুষ, কেনাকাটা করতে, মামলা মোকদ্দমা করতে শহরে আসে। বন্দুক রেজিস্টারী করতে, সিমেন্টের পারমিট বার করতে, বাড়ি তৈরীর লোন চাইতে কোলকাতায় এদের আনাগোনা। দিনের শেষে আবার হাওড়া কি শেয়ালদা ছুটে গেছে ট্রেন ধরতে। অথচ একটু সাধ আহ্লাদ থাকে মেয়েছেলের সঙ্গে গল্প করার, এক আধজনকে সঙ্গে নিয়ে রেস্টুরেণ্টে বসে চা খাবার, অথবা যদি একটু সময় হাতে থেকেছে তো রেবতীর বৌবাজারের সেই ভাড়া করা ঘরেও কেউ কেউ চলে যেত।

এভাবে দিন কাটছিল। পুরুষ আসত পুরুষ চলে যেত। আবার কত জন ঘর বাঁধবার কথাও বলত। রেবতী তখন হাসত। ওরা স্বপ্ন দেখত। কিন্তু রেবতী দেখত না। স্বপ্ন দেখা অনেকদিন আগেই সে ছেড়ে দিয়েছিল। ভিটেমাটি ছেড়ে এসে যেদিন শেয়ালদা স্টেশনে ডেরা বেঁধে থাকতে হয়েছিল সেদিনও যেন কিছু কিছু স্বপ্ন রেবতীর চোখের আনাচে কানাচে লেগে ছিল। তারপর ওই ডেরায় থাকতেই হাবুলের বাবার যখন শক্ত ব্যারাম হল, রাস্তায় বেরিয়ে তিনমাসের হাবুলকে কাঁধে নিয়ে রেবতীকে ভিক্ষা করতে নামতে হল সেদিন আর কোনো স্বপ্নের গুঁড়ো তার চোখে লেগে রইল না।

রুক্ষ কঠিন বাস্তবের দেওয়ালে কপাল ঠুকে ঠুকে রেবতীকে লম্বা পথটার অনেক দূর এগিয়ে যেতে হয়েছিল। একটা যক্ষ্মা রুগীকে কেউ কেবল ভিক্ষা করে বাঁচিয়ে তুলতে পারত কিনা রেবতীর জানা ছিল না। কিন্তু যেদিন জানল সেদিন অমরনাথও চোখ বুজল আর সে নিজেও সেই লম্বা পথের এমন একটা জায়গায় গিয়ে পৌঁছাল যেখান থেকে আর তার ফেরার উপায় ছিল না।

তাই রেবতী ভাবত পরে। তখন হাবুল একটু বড় হয়েছে। বেলেঘাটার একটা বস্তীতে রেবতী ঘর নিয়েছে। পুরুষ এসেছে চলে গেছে, কিন্তু কেউ তাকে কোনদিন জিজ্ঞেস করত না রেবতী কেন এ-পথে পা বাড়িয়েছিল। যদি কেউ জিজ্ঞেস করত তো নিশ্চয় নিজের কপালে আঙুল রেখে ইতিহাসটা সে বলতে পারত। যেন কাউকে বলবে বলে ইতিহাসটা সে মনে মনে তৈরী করে রেখেছিল। কিন্তু তেমন মানুষের দেখা সে পায়নি। যেন রেবতী ব্যবসা করতে নেমেছে, তাদের কাছে এই যথেষ্ট। তার পিছনে কোনো কারণ নেই ঘটনা নেই। মনে মনে রেবতী হাসত। ভাবত, এই তো হবে, তার খদ্দেররাও যে ব্যবসায়ী। তারা সুখ চাইত সঙ্গ চাইত তারপর কটা টাকা ফেলে দিয়ে চলে যেত।

হুঁ, যে কথা হচ্ছিল, রেবতীর কপাল ভাঙ্গতে আরম্ভ করেছিল। কিন্তু ষোল আনা ভাঙ্গার তখনও বাকি ছিল। কি জানি, যদি তখনো একটু আধটু স্বপ্ন দেখে সে। তাই কপালের যেটুকু অবশিষ্ট ছিল ঈশ্বর তাও দুমড়ে মুচড়ে ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে শেষ করে দিল। ঈশ্বর যে কত বড় রসিক রেবতী সেদিন হাড়ে হাড়ে টের পেল।

না, রাগ করল না সে। দু হাত শূন্যে উঁচিয়ে ঈশ্বরকে সেদিন গালিগালাজ করল না, অভিসম্পাৎ দিল না। কেবল চোখের তারা দুটো পাথরের ডেলার মতন স্থির শক্ত রেখে হাবুলের রক্তমাখা থেঁতলান শরীরটা দেখল। দুপুরে ছেলের হাতে পয়সা দিয়ে গিয়েছিল রেবতী, যেমন রোজ যায়, বাড়ি থেকে বেরোবার সময়

পই পই করে বারণ করেছিল, যেন রাস্তায় না বেরোয় হাবুল, সামনে গাড়ি ঘোড়া চলে, বড় রাস্তার ওই মোড়টায় অ্যাক্সিডেন্ট লেগেই ছিল। রোজই কথাটা বলে যেতে হত রেবতীকে, কিন্তু তবু নিশ্চিন্ত থাকতে পারত না। যতক্ষণ বাইরে থেকেছে কেবল ছেলের মুখটা মনে পড়েছে আর হাজারটা আশঙ্কা বুকের ভিতর মোচড় দিয়ে দিয়ে উঠেছে। আগে সন্ধ্যার পর সে যখন বাড়ি থেকে বেরোত হাবুলকে খাইয়ে দাইয়ে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে তবে বেরোত। কিন্তু পরে দিনের বেলায় বেরোতে আরম্ভ করে সেটা আর সম্ভব হত না।

তারপর আর কি, একদিন ঘরে ফিরে যা দেখার তাই রেবতীকে দেখতে হল। বাড়ির আর পাঁচটা ছেলের সঙ্গে তার ওই সাত বছরের ছেলেও কাটা ঘুড়ির পিছনে ছুটেছিল। তখন একটা লরী এসে—

ছেলের মুখটা চিনতে পারছিল না রেবতী। মাথাটাই বেশি থেঁতলে গিয়েছিল।

কিন্তু কত শক্ত না সে হতে পেরেছিল সেদিন। চোখের তারা দুটো পাথরের চেয়েও কঠিন করে রেখেছিল। না, এক ফোঁটা জল আসতে দেয়নি, একবার সে কাঁদেনি। পাড়ার অন্য মায়েরা মেয়েরা রেবতীর লরী চাপা পড়া মরা ছেলের জন্য কেঁদেছিল বিলাপ করেছিল। একলা রেবতী স্থির থাকতে পেরেছিল।

কাজেই তারপর যদি কেউ কোনদিন রেবতীকে ঈশ্বরের কথা আশার কথা সুযোগ অথবা সুদিনের কথা শোনাত তো খিল খিল করে সে হাসত। হাসতে হাসতে তার পেটে খিল ধরে যেত। যেমন তারপরও যদি কোন পুরুষ তাকে ঘর বাঁধবার কথা সংসার পাতবার কথা শুনিয়েছে তো হেসে সে কুটিকুটি হয়েছে।

কিন্তু কোন দিক দিয়ে যেন কী হয়ে গেল। তার বিশ্বাস ওলট পালট করে দিল মুকুন্দ।

মানুষটার কথা শুধু স্বপ্ন না, তার আশ্বাস ফাঁকা বুলি না। যেমন কথা তেমন কাজ।

তোমায় নিয়ে ঘর বাঁধব!

পুরুষের মতন পুরুষ বটে। ভয়ডর নেই লজ্জা নেই। রাস্তায় ঘুরছিলে তাতে হয়েছে কি। তোমার মন আমি বুঝতে পেরেছি, তোমার ভিতরটা আমি চিনতে পেরেছি। তেজী পুরুষের চোখ দুটো ধকধক করে উঠেছিল। চোখে জল নিয়ে রেবতী তার ইতিহাস বলেছিল, তেমনি চোখে একটা আক্রোশের আগুন নিয়ে মুকুন্দ বলেছিল, এসো, আমার সংসারে এসো, তুমি নতুন করে বাঁচবে।

কার ওপর এই আক্রোশ, কেন এই অভিমান রেবতী বুঝতে পেরেছিল। মুকুন্দ তার ইতিহাস বলেছিল।

কুলবধূ তার বিশ্বাস ভেঙেছিল, তাই যার একুল ওকুল সব গেছে এমন মেয়েকে বিশ্বাসের সিংহাসনে বসিয়ে সমাজের ওপর গোটা পৃথিবীটার ওপর মুকুন্দ শোধ তুলল।

তাই এই আশ্চর্য পুরুষের দিকে তাকিয়ে নতুন করে রেবতীর ঈশ্বরকে বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হচ্ছিল।

এত সুখ তার জন্য অপেক্ষা করবে কদিন আগেও কি সে জানত! ক'দিনের কথা। সাত দিন? দশ দিন? যেন এখনও চোখ বুজলে শেয়ালদা বৌবাজারের গিজগিজ মানুষ, ট্রাম বাস, ফেরিওয়ালা রিক্সাওয়ালা ট্রাফিক পুলিশের হাত তোলার সেই ছবি সে দেখতে পায় —যেন এখনও কান পাতলে গাড়ি ঘোড়ার ঘড়ঘড় মোটরের ভোঁ হাজার মানুষের হৈ হৈ সে শুনতে পায়, যেন এখনও ভাল করে গা শুঁকলে রেবতী তার গায়ে পোড়া পেট্রলের গন্ধ ভ্যাপসা ঘামের গন্ধ আর হাজারটা কামুক পুরুষের গরম নিশ্বাসের গন্ধ সিগারেটের গন্ধ লেগে আছে টের পায়।

অথচ কত ভাল সাবান এনে দিয়েছে মুকুন্দ, কী চমৎকার সুগন্ধ মাথার তেল। কত রকম স্নো ক্রিম।

আর কী শান্ত পরিবেশ, কত বড় বাড়ি কত বড় ঘর, কত বড় খাট, কত ভাল বিছানা!

তেমনি খাওয়া দাওয়া। এক একটা গরু চার সের পাঁচ সের করে দুধ দেয়। মুকুন্দ আজও জাল দিয়ে তার পুকুর থেকে এতবড় একটা রুই মাছ ধরিয়েছে। কাল দুবেলা দুটো মুর্গি কাটা হয়েছিল। বলাই মুর্গির মাংস খায় না। মুকুন্দ এবং রেবতী সব মাংস খেয়েছে।

রান্নার ঝি রয়েছে। রেবতী আপত্তি করেছিল। সে কি নিজের হাতে এতকাল রেঁধেবেড়ে খেয়ে আসেনি। চিরকাল তো কষ্ট করেই এসেছে, এখন কি দুজনের জন্যে দুটো ভাত ফুটাতে পারবে না?

সে যখন এসে গেছে, খামকা আর খোরাকী দিয়ে টাকা দিয়ে একটা লোক রাখা কেন। রেবতী অনায়াসে সব করতে পারবে। কিন্তু মুকুন্দ মাথা নেড়েছে। না, তা হয় না। এই সংসারে চিরকাল যে নিয়ম চলে এসেছে এখনও তাই থাকবে। মুকুন্দর মায়ের আমলে রান্না করার লোক ছিল, বিমলার আমলে ছিল—সুতরাং রেবতীর আমলে থাকবে না, এটা কোন কাজের কথা নয়। তুমি আমার স্ত্রী, আমার ঘরণী, কাজেই এ বাড়ির গিন্নীর যোল আনা মর্যাদা তুমি ভোগ করবে। এর একচুল ব্যতিক্রম হতে আমি দেব না।

এবং মুকুন্দ তা হতে দেয়ওনি।

রেবতীর স্নানের জল তোলার জন্য কাপড় ধোয়ার জন্য অতিরিক্ত একটি ঝি রাখা হয়েছে। এরা এই গাঁয়ের মানুষ। কাজকর্ম সেরে দিয়ে যে যার ঘরে ফিরে যায়।

সুতরাং রেবতীর অখণ্ড অবসর।

সংসারের কিছুই তাকে দেখতে হয় না। বলাই সব দেখে। বুড়ো হয়েছে। সংসারের কিছু কিছু কাজ সে এখনও নিজের হাতে করে, বাকী সব ঝি চাকরদের দিয়ে করায়।

তাই এত বড় উঠোন এত বড় বড় এক একটা ঘর আর মাথার

ওপর এত বড় একটা আকাশ দেখে রেবতীর এক এক সময় মনে হয় সময় যেন আর কাটে না।

তাও বাড়িতে যদি একটা ছোট মেয়ে কি ছেলে থাকত। দুটো ঝি তো দুবেলা নিজেদের কাজ নিয়ে ব্যস্ত, কাজ সেরে কতক্ষণে ঘরে ফিরবে সেদিকে তাদের নজর। তাদের সঙ্গে আর কী গল্প করবে। আর আছে বাইরের চাকর নিতাই। উঠোন ঝাট দেওয়া বাগান সাফ করা নিয়ে সর্বদাই সে ছুটোছুটি করছে। তার সঙ্গেও কথা বলা যে চলে না। আর ঝি চাকরদের সঙ্গে গল্প করাটাও মুকুন্দ ভাল চোখে দেখবে না রেবতী ক' দিনেই বেশ বুঝে গেছে।

গিন্নীর মর্যাদা নিয়ে রেবতীকে চলতে হবে।

একমাত্র কথা বলার মানুষ বলাই। বলাইকে মুকুন্দ চাকরের মতো দেখে না। সে এ বাড়ির আত্মীয় বন্ধু শুভানুধ্যায়ী—বুঝি তার চেয়েও বেশি, বাপের আমলের এই বুড়োকে মুকুন্দ এই সংসারের অভিভাবক বলে মনে করে। ভাল মন্দ সমস্ত ব্যাপারে বলাইদার সঙ্গে মুকুন্দ পরামর্শ করে।

কিন্তু বলাইকেও কি সারাদিনের মধ্যে অন্তত একবার হাতের কাছে পাওয়া যায়? বুড়ো যেন এ বাড়ির সবচেয়ে বেশি বাস্তবাগীশ মানুষ। হাঁস মুরগী ছাগল নিয়ে গোয়াল নিয়ে, পুকুর খেত খামার তদারক করা নিয়ে সারাদিন টইটই করে ঘুরছে। তার এক দণ্ড অবসর নেই কারো সঙ্গে বসে গল্প করার, কথা বলার। যখন ঘরে ফিরল তখন সন্ধ্যা হয়ে গেল। লেবুতলার ধারের বাগানের কাছে বুড়োর ছোট ঘর। সন্ধ্যা হতেই বুড়োর ঘরের ঝাঁপ বন্ধ হয়ে যায়। মানুষটার আর তখন সাড়া শব্দ পাওয়া যায় না। তাইতো, এই বয়সে সারাদিন এত খাটাখাটনি, দিনের শেষে ঘরে ফেরার সঙ্গে সঙ্গে দেহ ভেঙ্গে পড়ে, আর নড়াচড়া করার শক্তি থাকে না। এখানে এসে প্রথম দু'একদিন রেবতী তাই ভেবেছিল। কিন্তু এখন দেখছে, তা নয়।

রাত বারোটার পর বলাই জেগে ওঠে।

মানুষটা তখন কাশছে, যেন খড়ম পায়ে হটর হটর করে ধানের মরাইয়ের এপাশ দিয়ে চলাফেরা করছে, নয়তো ঘরে বসে হুঁকো টানছে। হুঁকোর পটর পটর শব্দ পরিষ্কার শোনা যায়।

এবং তারপর থেকে বাকি রাত যেন বুড়ো জেগে থাকে, যদি রাত শেষ হবার আগে আবার একটু গড়িয়ে নেয়। কিন্তু সূর্য উঠবার আগেই বাইরের উঠোনে বলাইর গলা শোনা গেল।

অর্থাৎ অর্ধেক রাত জেগে কাটালেও এ বাড়ির অন্য কারুর ঘুম ভাঙ্গবার আগে তার ঘুম ভাঙ্গবেই।

বুড়ো বয়সে চোখের ঘুম কমে যায়—তাই না? হেসে সেদিন মুকুন্দকে কথাটা বলেছিল রেবতী।

মুকুন্দ বলেছিল, তা ঘুমটা এই বয়সে কমে যায় বটে, কিন্তু আসলে বলাইদা রাত জেগে আমার ধানের মরাই পাহারা দেয়। আমি নাক ডাকিয়ে ঘুমোই, কিন্তু বলাইদার দুশ্চিন্তা অনেক বেশি। রাত্রে তিনবার বেরিয়ে ধানের গোলা দেখবে। পুকুরের ধারে গিয়ে পুকুর দেখে আসবে। দরকার হলে কেরোসিনের লণ্ঠনটা হাতে ঝুলিয়ে বাগানে ঢুকে পড়ে আম কাঁঠাল সুপুরী নারকেল গাছের মাথাগুলোও দেখে আসবে। কথা শেষ করে মুকুন্দ হেসেছিল। এবাড়ির কুটোটাও কেউ চুরি করে নেবে, বলাইদা তা হতে দেবে না, কাজেই চোখে ঘুম এলেও বুড়ো ঘুমোতে পারে না। রাত জেগে তামাক খায় আর আমার ঘর বাড়ি পুকুর পাহারা দেয়।

এখানে বুঝি খুব চোরের উৎপাত? রেবতী প্রশ্ন করেছিল। মুকুন্দ মাথা নেড়েছিল।

উহুঁ, এ গাঁয়ে চুরি টুরি খুব কম হয়—অন্তত আমাদের বাড়িতে কোনদিন চুরি হয়েছে ছেলেবেলায় বাবা মার মুখে আমি শুনিনি—আর বড় হয়েও তো এক আধদিন চোরটোর ঢুকতে দেখলাম না। কি পুকুরের মাছ চুরি করে নিয়ে গেছে, বাগানের ফল নিয়ে গেছে, ঘরের কোনো জিনিস।

তবে তোমার বলাইদার এত দুশ্চিন্তা কেন ?

স্বভাব। মুকুন্দ এবার শব্দ করে হেসেছিল।

বুড়োর কেবলই ভয় অন্ধকার হলেই এবাড়ির চারদিকে চোর ডাকাত ঘোরাফেরা করে, সুযোগ পেলেই পুকুরের মাছ তুলে নিয়ে যাবে, নয়তো ঘরে সিঁদ কাটবে, কি গোলার সব ধান লুঠ করে নেবে।

হয়তো তাই। একটু ভেবে নিয়ে রেবতী বলেছিল। বুড়োর ভয়েই এ বাড়িতে চোর ডাকাত ঢুকতে সাহস পায় না। মানুষটা সারারাত জেগে আছে, অত্যন্ত সতর্ক সন্দিগ্ধ চোখ নিয়ে সারাক্ষণ তাকিয়ে আছে এ বাড়ির কুটোটা না কেউ চুরি করে—কাজেই—রেবতী কথাটা শেষ করেনি।

মুকুন্দ কেন জানি তখন গম্ভীর হয়ে গিয়েছিল। হঠাৎ তার এমন গম্ভীর হয়ে থাকা কেন রেবতী বুঝতে পারেনি। পরে চিন্তা করে কারণ ধরতে পেরেছিল।

তাই তো, যে বাড়িতে বলাইর মতন সতর্ক একটা প্রহরী আছে, মুকুন্দর মতন জোয়ান জবরদস্ত সাহসী একটা পুরুষ আছে সেই বাড়ির বউ কেমন করে এক কাঠের মিস্ত্রীর সঙ্গে পালিয়ে যেতে পারে—

সেদিন চুরির কথা উঠতে মুকুন্দ নিশ্চয় নতুন করে জিনিসটা চিন্তা করেছিল, তাই এমন গম্ভীর হয়ে গিয়েছিল।

এই নিয়ে রেবতী মুকুন্দকে আর কিছু প্রশ্ন করল না।

এবং মুকুন্দর সেই বউ, যার নাম বিমলা, কতখানি ধূর্ত ও দুঃসাহসী ছিল, এই নিয়েও রেবতী মাথা ঘামাবার বিন্দুমাত্র প্রয়োজন বোধ করল না।

সে তার নিজের কথাই চিন্তা করছিল, তার পরিবর্তন, তার নতুন জীবন।

এবং ঈশ্বর বলে যে একজন কেউ মাথার ওপর আছেন, এক সময়

না এক সময় তিনি মানুষের দিকে মুখ তুলে তাকান, তার দুঃখ মোচন করেন—আজ কায়মনোবাক্যে তা বিশ্বাস করতে পেরে রেবতী বড় বেশি পরিতৃপ্তি বোধ করছিল।

কিন্তু ওই যে, মুকুন্দ যতক্ষণ বাড়ি আছে, কাছে আছে ততক্ষণ সময়টা বেশ কাটে। কথা হাসি গল্প। একত্র বসে খাওয়া শোয়া, একত্র বাগানে বেড়ান, দীঘির ধারে বাঁধানো চাতালে গিয়ে কিছুক্ষণ বসা।

কিন্তু মুকুন্দর অনেক কাজ থাকে। কত বড় সংসার। চাষ বাস এটা ওটা—কত দিকে তাকে নজর রাখতে হয়। মাঝখানে সে অবশ্য সবই ছেড়ে দিয়েছিল। কিছুই দেখত না। কিন্তু আজ তো আর একথা বললে চলবে না। নতুন মানুষ তার জীবনে এসেছে। নতুন উৎসাহ ফিরে পেয়েছে সে। তাই ষোলআনা নিষ্ঠা নিয়ে উদ্যম নিয়ে আবার এখন সব কিছু দেখছে।

রেবতী এক সময় বলে, সারাদিন এত মাঠে মাঠে না ঘুরলে কি নয় ?

মুকুন্দ হাসে।

গত বছর পাটের ফসল ভাল হয়নি। তেমন করে জমিতে লাঙল পড়েনি, ভাল সার দেওয়া হয়নি। বলাইদা একলা মানুষ, কদিকে চোখ রাখবে, নিরানীর কাজও ঠিক মত করা হয়নি। জনেরা ফাঁকি দিয়েছে, তাই পাটটা একেবারে নষ্ট হয়ে গেল, কিন্তু এবার আর তা হতে দিচ্ছি না, গেলবারের ঘাটতি ষোল আনা উশুল করতে হবে, এবার যা পাট হবে দেখো !

কি হবে অত পাট দিয়ে ? রেবতী প্রশ্ন করেছিল।

টাকা আসবে ? মুকুন্দ তৎক্ষণাৎ উত্তর করেছিল। পাটেই তো আমাদের চাষীদের টাকা।

কি হবে তোমার এত টাকা দিয়ে ? রেবতী আবার প্রশ্ন করেছিল। তোমার ছেলেপুলে নেই—কথাটা বলেই হঠাৎ থেমে গিয়েছিল সে।

কিন্তু মুকুন্দ থেমে থাকেনি, বা—রে। এমন করে সে হেসেছিল, যেন রেবতী ছেলেমানুষের মতন একটা কথা বলে ফেলেছে। ছেলেপুলে হতে কতক্ষণ। বলে রেবতীর ভারি চোখের দিকে চোখ রেখে হঠাৎ থেমে যেতে চেয়েছিল, কিন্তু মানুষটার মনের জোর অন্য রকম, একটুখানি যদি হতাশার মেঘ দেখা গেল তো তৎক্ষণাৎ জোর করে হেসে সেই মেঘ উড়িয়ে দেবার ক্ষমতাও রাখে সে, তুবার মাথাটা ঝাঁকিয়ে চোখের তারা দুটো গোল করে রেবতীর মুখের দিকে তাকিয়ে সে ঠিক সাত বছরের শিশুর মতন হাসতে আরম্ভ করল। আমি এখনই আশা ছাড়তে পারি না। উঁহু, যেমন নতুন ঘর বেঁধেছি তেমনি নতুন কচিমুখ এ ঘর আলো করবে একদিন, এই বিশ্বাস আমার পুরোপুরি আছে রেবতী।

শুনে রেবতী মুখ লাল করে মাঠের দিকে চোখ রেখে পায়ের আঙুল মেঝেয় ঘষছিল, অল্প অল্প হাসছিল।

আর, সে তো ভবিষ্যতের কথা। মুকুন্দ তারপর বলেছিল, এই মুহূর্তে আমার টাকার দরকার, এত এত টাকা না হলে, বুঝলে, একটা মানুষকে ঘরে এনেছি, তাকে যে কেবল দুঃখ পেতে হবে।

এবার রেবতী ফিক করে হেসে ফেলেছিল। তারপর কৃত্রিম রাগের ভান করে উত্তর করেছিল, আহা, যেন কখনো তোমার নতুন মানুষটা আধপেটা খেয়ে আছে, তালি দেওয়া কাপড় পরছে— তোমাকে রোদ জল মাথায় নিয়ে সারাদিন মাঠে পড়ে থেকে কেবল ধান পাট দেখতেই হবে।

মুকুন্দ চুপ থেকে সিগারেট টানছিল।

দরকার নেই এত পরিশ্রম করার—যদি এবারও পাট ভাল না হয় তো আমি মোটা কাপড়ই পরব, মোটা ভাত খাব। তা বলে তুমি খেটে খেটে শরীর নষ্ট করবে, তা আমি হতে দেব না। কিছুতেই না। মুকুন্দর দুহাত জড়িয়ে ধরেছিল রেবতী। মুকুন্দ অবাক হয়ে

'নতুন বউয়ের' চোখ দুটো দেখছিল। রেবতীকে মাঝে মাঝে 'নতুন বউ' বলে ডাকছিল সে। রেবতীর চোখে জল।

আচ্ছা, ঠিক আছে, তোমার কথা রাখব। মুকুন্দ একটা গাঢ় নিশ্বাস ফেলেছিল। চুপ করে ছিল কিছুক্ষণ। চুপ থেকে পরে বলেছিল, অবশ্য আমার খাটনি কি, আমাকে তো গায়ে গতরে কিছু করতে হয় না, সঙ্গে থেকে লোকজনের কাজ দেখি, কিন্তু তুমি যদি মনে কষ্ট পাও, না হয় এবার থেকে মাঠে একটু কমই যাব।

শুনে রেবতী আশ্বস্ত হয়েছিল।

এবং সেদিন সারাটা দুপুর বিকেল ঘরে থেকে মুকুন্দ রেবতীর সঙ্গে গল্প করেছে, তারপর সন্ধ্যার দিকে দীঘির পাড় চাতালে গিয়ে বসেছে তারা। দীঘির পূব পাড়ে ছাতিম গাছের পিছন দিয়ে এতবড় একটা চাঁদ উঠছিল, কোনদিকে একটা কোকিল ডাকছিল, আর ফাগুনের মুখচোরা দক্ষিণা বাতাস বইতে আরম্ভ করেছে তখন।

রেবতীর একটা হাত কোলে টেনে নিয়ে মুকুন্দ বলছিল, তখন ভাল করে কথাটা বুঝিয়ে বলতে পারিনি, আসল কথা কি জান রেবতী, যে যাকে ভালবাসে সে তাকে সর্বস্ব দিতে পারলে যেন খুশি হয়। আজ আমি কেবলই ভাবছি, আমার গোলাভরা ধান থাকবে, শ'শ মণ পাট উঠবে ঘরে, আর এত টাকা আসবে যে আমার সিন্দুক উপচে পড়বে—আর সব তোমায় দিতে পেরে আমি সুখী হব, শান্তি পাব। তাই যেন এখন মাথায় এক চিন্তা, কি করে এটা বাড়বে, কি করে ওটা বাড়বে, কি করে আরো টাকা—

মুকুন্দকে শেষ করতে দিল না রেবতী।

থাক, আমায় তুমি একটু কমই ভালবাসবে। একটু কম দিলেই আমি খুশি থাকব। রেবতীর চোখ দুটো আবার ছলছল করে উঠেছিল। একটি মানুষকে তো উজোড় করে ভালবাসা ঢেলে দিয়েছিলে, তাতে তুমি কী পেয়েছিলে দেখলে তো—আমাকে একটু কম ভালবাসা দিলেই আমি সন্তুষ্ট থাকব।

কিন্তু তাতে আমি সন্তুষ্ট থাকব কেন নতুন বৌ—আর একজন আমার সব ভালবাসা পা দিয়ে মাড়িয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে বলে কি তোমাকে কম ভালবাসতে হবে। আমি জানি, কম খেয়েও তুমি খুশি থাকবে, বরং আমি যেটুকু তোমাকে দিতে পারব না, আমায় ভালবেসে তুমি সেই ফাঁক ভরিয়ে তুলবে—কিন্তু তা তো আমি শুনছি না, আমি আমার সর্বস্বই তোমাকে দেব।

রেবতী আর কথা বলেনি।

মুকুন্দর কাঁধে মাথাটা এলিয়ে দিয়ে প্রকাণ্ড চাঁদটা দেখছিল। মুকুন্দ তার মাথায় হাত বুলোচ্ছিল।

কিন্তু ঐ একদিনই হাত পা গুটিয়ে ঘরে বসে থেকে রেবতীর সঙ্গে গল্প করা।

পরদিন আবার কাজে যেতে গেছে মুকুন্দ। রেবতীর নিষেধ মনে রাখে নি। ভাল করে ভোর হওয়ার আগেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে। তাই তো, তখন রেবতী একা একা বিছানায় শুয়ে চিন্তা করেছে, এই পুরুষ কি কেবল মুখের ভালবাসা দিয়ে তুষ্ট থাকতে পারে। তার দৃষ্টি যে অনেক বড়, তার হৃদয়টা যে একটা সমুদ্র। সেই সমুদ্রে যখন ভালবাসার ঢেউ ওঠে তখন কী ভয়ঙ্কর মূর্তি ধরে তা কি রেবতীকে বলে দিতে হবে? ক'দিনে কি মানুষটার পরিচয় সে পায়নি। মাঠ ভরে মুকুন্দ ফসল ফলাচ্ছে রেবতীর জন্য, বাগান ভরে ফল ফলাচ্ছে রেবতীর জন্য, পুকুর ভরে মাছ জিয়োচ্ছে রেবতীর কথা ভেবে। কেবল কথায় ভালবাসা দিয়ে একটি মানুষকে সুখী করা যায় না। কেবল কথা শুনে যদি রেবতী নিশ্চিন্ত থাকতে পারতো তো এ জীবনে কম কথা শুনেছে কি সে। ইনিয়ে বিনিয়ে কত কথা বলেছে এক একটি পুরুষ। আর সেসব কথায় কত রঙ চড়িয়েছে তারা। কিন্তু রেবতী শুধু তাকিয়ে থাকত, তাকিয়ে দেখত কতক্ষণে তার পকেটে হাত ঢোকাবে, টাকা বার করবে। হাতে টাকা পেয়ে তবে রেবতীর ভাল লেগেছে, তখন মনোযোগ দিয়ে রঙের কথা সোহাগের কথা শুনেছে সে। আর এ তো দু-এক ঘণ্টার ভালবাসা নয়, ভাড়া করা পায়রার টঙে বসে ভালবাসা নয়। এ ভালবাসা সারা জীবনের জন্য। এ ভালবাসা স্বামী-স্ত্রীর ভালবাসা। মুকুন্দ তাকে স্ত্রীর আসনে বসিয়েছে। সুতরাং তার ভালবাসা বলতে সামান্য দুখানা কাগজের নোট নয়। তার ভালবাসা কুড়ি বিঘা জমি, প্রকাণ্ড দুটো পুকুর, আম কাঁঠাল সুপুরী নারকেল নিয়ে বিশাল একটি বাগান। এই ঘর এই উঠোন সব রেবতীকে দিয়েছে সে।

রেবতীর যাতে কোনোদিন টাকার ভাবনা না থাকে এখন তাই নিয়ে মুকুন্দর মাথাব্যথা। আরো ফসল বাড়াবে সে, আরো ক'বিঘা ধানের জমি কিনবে।

তাই এক এক সময় রেবতীর বুক কাঁপে, এত প্রেম এত নিশ্চিন্ততা এত সুখ যদি সে সহ্য করতে না পারে? এখনো তার শরীরে দেশী মদের ঝাঁজ লাগা পুরুষের নিশ্বাসের গন্ধগুলো যেন সে টের পায়, শেয়ালদা বৌবাজারের রাস্তার ধুলো ঘাম হৈ-হট্টগোলের দিনগুলি থেকে থেকে যেন মনে পড়ে। রেবতী তখন ভয়ঙ্কর অস্বস্তিবোধ করে। কোনো ছবি ঢেকে রাখবার জন্য মানুষ যেমন একটা কালো পর্দা টেনে দেয়। তেমনি কদিন আগের সেসব ছবি সেসব গল্প সব ভুলে যেতে যা হোক একটা কাজে রেবতী নিজেকে ভুলিয়ে রাখে। তাড়াতাড়ি কাঠের বাক্স থেকে মুকুন্দর শার্ট পাঞ্জাবি গেঞ্জি পাজামা টেনে নামিয়ে ধুলোটুলো ঝেড়ে আবার সেগুলি একটা একটা করে গুছিয়ে রাখে। যেগুলি ময়লা হয়ে গেছে ধোপাবাড়ি পাঠিয়ে দেয়। মুকুন্দর টেবিলটা গুছিয়ে রাখে। ফুলদানির ফুল শুকিয়ে গেছে চোখে পড়া মাত্র বাগানের মালীকে দিয়ে তাজা ফুল আনিয়ে নেয়। মুকুন্দ এসে স্নান করে ভাত খাবে, রান্নার কতটা হল দেখতে রান্নাঘরে একবার উঁকি দিয়ে আসে এবং সেই সঙ্গে মুকুন্দ এবেলা ঝাল খাবে কি ঝোল খাবে সেই সম্বন্ধে রাঁধুনি সোনার মাকে একটা দুটো উপদেশ নির্দেশ ও দিয়ে আসে। তারপর চাকরকে দিয়ে মুকুন্দর স্নানের জল তুলিয়ে রাখে। তেল সাবান তোয়ালে স্নানের জায়গায় নিজের হাতে রেখে আসে।

বিকেলে সোনার মা বাড়ি থাকে না। তার ফিরতে সন্ধ্যা উতরে যায়, উনুন ধরাতে ধরাতে সেই রাত। কাজেই কেরসিন স্টোভটা ধরিয়ে রেবতী নিজের হাতে মুকুন্দর বিকালের জলখাবার তৈরী করে রাখে। কাজটা হয়ে যাবার পর শোবার ঘরটা নতুন করে সে গোছাতে আরম্ভ করে। এই ব্রেকেটের সার্ট পাঞ্জাবি ঐ ব্রেকেটে

নিয়ে যায়। এই আলনার শাড়ি সায়া ও আলনায় ঝুলিয়ে রাখে। পা-পোষ দুটো ঝেড়েটেড়ে ঠিক করে বসিয়ে দেয়। তারপর তাদের জোড়া খাটের কাছে এসে নূতন করে বিছানা পাতে। বাসি চাদর সরিয়ে দিয়ে ধোয়া চাদর বিছায়, বালিশের ঢাকনা বদলে দেয়। সব কাজ শেষ করে রেবতী গা ধুতে চলে যায়। যাবার আগে, অবশ্য আর একটা কাজ সেরে নেয়। বারান্দায় বসান চন্দ্র মল্লিকার টব দুটোতে জল দিয়ে যায় রেবতী, বাগানের ফুল গাছে জল দিতে মালি রয়েছে, কিন্তু এ দুটো ফুলের চারার যত্ন রেবতী নিজের হাতে করে। তা-না হলে সে শান্তি পায় না। গা ধুয়ে এসে আরসির সামনে দাঁড়িয়ে প্রসাধন করে। চুল বাঁধে কাজল পরে ঘাড়ে গলায় একটু পাউডার বুলোয়। তারপর পোষাক পাল্টায়। ওবেলা যদি তাঁতের শাড়ি পরেছিল এবেলা সিল্ক পরে, শাড়ির রঙের সঙ্গে মিলিয়ে নতুন ব্লাউজ।

কিন্তু তারপর? ঘর গুছানো হল, সাজাগোজা হল, তারপর সময় যে আর কাটতে চায় না। এখন দুপুর না রাত না যে ঘরের দোর ভেজিয়ে দিয়ে বিছানায় শুয়ে সময়টা কাটিয়ে দেওয়া চলবে। মুকুন্দর ফিরতে অন্ধকার হয়ে যাবে। কিন্তু এখন? গাছের মাথায় মাজা কাসার রং নিয়ে বিকেলের রোদ ঝকঝক করছে, কাল সন্ধ্যাবেলা মুকুন্দকে নিয়ে সে যখন দীঘির ধারে চাতালে বসেছিল তখন যদি একটা কোকিল গাছের মাথায় ডাকতে আরম্ভ করেছিল, এখন যেন দশদিক থেকে দশটা কোকিল ডেকে উঠে পৃথিবীটাকে আরও গরম করে তুলল। আজ আর মুখচোরা লাজুক বাতাস না, যেন ভারি ফুর্তিবাজ ফুরফুরে একটা বাতাস দক্ষিণ দিক থেকে বইতে শুরু করেছে। রেবতীর সিল্কের আঁচল উড়ছিল, কপালের চুল নড়ে চড়ে যাচ্ছিল।

এমন একটা সময়, এতবড় একটা নির্জন থমথমে উঠোন সামনে নিয়ে একলা ঘরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকতে রেবতীর কেমন-

লাগছিল। যেন তার মন চাইছিল কেউ কাছে থাকুক, কেউ গল্প করুক। ওপাশে বাগানের পিছনে মালী কি চাকরটা যেন একটা গাছ কাটছিল। খুপ খুপ শব্দটা রেবতীর বুকে এসে ধাক্কা দিচ্ছিল। যেন তাকে মনে করিয়ে দিচ্ছিল, তুমি এখন বড়ো অসহায়, বড়ো নিঃসঙ্গ।

তাই তো, সঙ্গী সে এখন কোথায় পাবে। একবার তার ইচ্ছা হল মাঠের কাছে ছুটে যায়, নিশ্চয় সেখানে মুকুন্দকে দেখতে পাবে বলাইকে দেখতে পাবে। মাঠের জমিতে লাঙল চষা হচ্ছে, লাঙলীদের কাজ দেখছে ওরা।

কিন্তু ইচ্ছা হল বলে কি আর রেবতী সেখানে ছুটে যাবে। ইচ্ছাটাকে সে কিছুতেই মাথা জাগাতে দিল না। তারা কাজের মানুষ, কাজ করছে সেখানে, এখন রেবতীর ছুটে যাওয়ার অর্থ দাঁড়াবে মুকুন্দকে তার দিকে আকর্ষণ করা, মুকুন্দ আর কিছুতেই মাঠের দিকে মনোযোগ দিতে পারবে না। রেবতীর সঙ্গে গল্প করবে। রেবতীকে নিয়ে এক জায়গায় বসে পড়বে, নয়তো বলবে, চলো ওদিকে একটু হেঁটে আসি।

মুকুন্দ কি তাতে খুশি হবে? মুকুন্দ হবে। কিন্তু তার ব্যস্তবাগীশ বলাইদা কিছুতেই জিনিসটা ভাল চোখে দেখবে না, ভাববে এটা নতুন বৌয়ের বাড়াবাড়ি, সারারাতই তো পড়ে আছে মুকুন্দের সঙ্গে গল্প করবার, এখন কাজের সময় এ ভাবে মাঠে ছুটে না এলে কি চলত না। মাঠের চাষাভূষোরাও চোখ টেপাটিপি করে হাসবে।

তা-ছাড়া, আজ মুকুন্দ খুশি হবে, কালও মাঠের কাছে রেবতীকে হঠাৎ দেখতে পেয়ে মানুষটা চঞ্চল হয়ে উঠবে, কিন্তু পরশু?

নিশ্চয় সেদিন মুকুন্দ আর খুশি হবে না। মুখে কি বলবে না, কিন্তু ভিতরে ভিতরে সে বিরক্ত হবে। ভাববে, রেবতীর আদিখ্যেতা আরম্ভ হয়েছে। বেশি আদর সোহাগ পাবার লোভে মুকুন্দকে কাছে টেনে নেবার মতলব, অথচ, মুকুন্দ তাকে এত করে বুঝিয়েছে,

এবার তার পাটের ফসল ভাল হওয়া চাই, ধানের ফসল বাড়াতে হবে, আর সব কিছুই সে করছে রেবতীর সুখের কথা ভেবে। এই সংসারে এসে যাতে তাকে কোনদিন কোনরকম অভাবের মধ্যে পড়তে না হয়, তাছাড়া ভবিষ্যতে যদি তাদের—

রেবতীর কান দুটো ঈষৎ লাল হয়ে উঠল, মুকুন্দ যেমন আশা ছেড়ে দেয়নি, রেবতী নিজেই কি সবটুকু আশা বাতাসে উড়িয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছে? না, তা নয়। এমন কি বয়স তোর পার হয়নি যে সন্তানের কথা উঠলে সে হেসে উড়িয়ে দিতে পারবে। সত্যি পারছে না কিন্তু।

একটা সলজ্জ হাসি মুখে নিয়ে রেবতী বারান্দা ছেড়ে উঠোনে নামল। চিন্তাটার সঙ্গে সঙ্গে একটা সুখের শিহরণ সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে পড়ল। না, এ সময় কিছুতেই মুকুন্দর কাছে যাওয়া উচিত হবে না। মুকুন্দ কাজ করুক, যে মেয়ে পুরুষকে কাজ করতে দেয় না, সারাক্ষণ আঁচলে বেঁধে রাখে, সেই মেয়ে অপয়া অলক্ষ্মী, কোনদিন তার সংসারের বাড় নেই, দারিদ্র্য দশা কাটে না। ছেলেবেলায় রেবতী কি মা মাসীর মুখে কথাটা শোনে নি? হুঁ, একদিন রেবতীরও ছেলেবেলা ছিল, মা মাসী ছিল। তা ছাড়া, স্বামী পুত্র নিয়ে যার সংসার সেই মেয়েকে কি ভাবে চলতে হয় রেবতী কি একেবারে ভুলে গেছে? ভুলে যায়নি? মাঝখানের ক'টা বছরের একটা বিদঘুটে জীবন তার সমস্ত স্মৃতি চাপা দিয়ে রেখেছিল শুধু। আজ আবার সব মনে পড়ছে। আজ তার হাবুলকেও খুব মনে পড়ে। আর থেকে থেকে গলার কাছে একটা কান্না তির তির করে ওঠে।

কিন্তু এই জন্য আজ তার মনে কোন অভিমান নেই। সবই ঈশ্বরের হাত। ঈশ্বর একদিন যেমন কঠিন হাতে তার সব কি কেড়ে নিয়েছিল আজ আবার তেমনি তাকে সব কিছু দিতেও আরম্ভ করেছে। এবং এই দেওয়া একটুখানি দেওয়া নয়। অনেক বেশি দেওয়া। মুকুন্দর মতন সুন্দর পুরুষ। জমিজমা বাগান পুকুর নিয়ে

এতবড় একটা সংসার। গোলাভরা ধান, গুদামভরা পাট, তেমনি মুগ মশুর কলাই খেসারি বোঝাই কত বড় এক একটা ধামা। কত গরু ছাগল হাঁস মুরগী। যে দিকে তাকান যায় প্রাচুর্য ছাড়া কিছু চোখে পড়ে না আর সেই সঙ্গে মানুষটার আদর সোহাগ ভালবাসা। কুলছাপান নদীর মতন রেবতীকে যে এক এক সময় ভাসিয়ে নিতে চায় রেবতী কি তা অস্বীকার করতে পারবে। পারে না।

কেবল সময় সময় যা একটু নিঃসঙ্গবোধ করে। তা আর করা কি।

বাড়িতে মানুষ কই। একটি ছেলে নেই একটা মেয়ে নেই। আত্মীয়স্বজন কেউ কাছে নেই মুকুন্দর। ভাই বোন কোনকালে ছিল না। বাপের এক ছেলে, বাপ মাকে তো অনেকদিন আগেই হারিয়েছে, এক বুড়ি বিধবা জেঠি নাকি মুকুন্দর কাছে ক'বছর ছিল। জেঠিও বছর তিন আগে মারা গেছে।

কাজেই বাড়ি খাঁ খাঁ করছে।

ঝি-চাকরেরা এত বড় বাড়ির কোথায়—কোন কোণায় নিজেদের কাজ নিয়ে থাকে অনেক সময় বোঝাই যায় না। যখন মুকুন্দ বাড়ি ফিরে আসে বলাই ফেরে তখন তাদের গলার শব্দে বাড়ি একটু জেগে ওঠে। তখন তবু বোঝা যায় বাড়িতে একটা দুটো মানুষ আছে। অন্য সময় ঘরদুয়ার উঠোন মরুভূমি মনে হয়।

রেবতীর অস্বস্তি লাগবার কথা। লাগে। অস্বীকার করার উপায় নেই। অথচ এই নির্জনতা চুপচাপ যে তার জীবনে ঈশ্বরের আশীর্বাদ হয়ে এসেছে এ-ও সে বোঝে। গাড়ি ঘোড়ার শব্দে কানে তালা লেগে গেছে এক এক দিন, ভিড়ের মধ্যে হাঁটতে হাঁটতে দম বন্ধ হয়ে এসেছে এক সময়। পরদিন আর সেই ভিড় ও শব্দের মধ্যেই তাকে ছুটে যেতে হয়েছে। তখন ভাবত এই অভিশাপ থেকে কি তার মুক্তি নেই?

আজ অভিশাপ শেষ হয়েছে, কলরব থেমে গেছে, ভিড় অনেক

পিছনে ফেলে এলো—তবে কেন সে নতুন করে হাঁপিয়ে উঠছে ভেবে পায় না।

অস্বাভাবিক না। তখন সে চিন্তা করে, সইতে দেরী হচ্ছে। কোথায় শেয়ালদা বউবাজারের রাস্তা আর কোথায় পৃথিবীর এক নির্জন প্রান্তে রসুলপুর গ্রাম।

বাড়ির ভেতরটা যেমন খাঁ খাঁ করে তেমনি বাড়ির বাইরে এসে দাঁড়ালেও ঘরবাড়ি চোখে পড়ে না, গাড়ি ঘোড়া দেখা যায় না। কেবল পাতার শব্দ পাখীর শব্দ। এক আধটা গরুর গাড়ি কঁ্যাচর কঁ্যাচর শব্দ করে ধূলো উড়িয়ে হাট গঞ্জের দিকে যাচ্ছে কি সেসব জায়গা থেকে ফিরে আসছে একটি দুটি গেঁয়ো মানুষ।

এক পা এক পা করে রেবতী এগোয়। হাঁটতে ভাল লাগছিল। অনেক হেঁটেছে সে এই জীবনে। আজ হঠাৎ ঘরে বসে থেকে পা দুটো পাথরের মতন ভারী হয়ে গেছে বলে তার এক এক সময় মনে হয়, শিরাগুলি বুঝি শক্ত হয়ে গেল, হাঁটুর জোর চলে গেছে। অবশ্য সেসব কি ই হয় নি, হাঁটতে আরম্ভ করে রেবতী বুঝতে পারল। সুন্দর হাঁটতে পারছিল সে। মুকুন্দর সঙ্গে ক'দিন বাগানে পায়চারী করেছে, বড় জোর দীঘির ধারে গেছে—তার বেশি না, আর সেই হাঁটা বিশ্রামের হাঁটা গল্প করতে করতে হাঁটা।

আজ মুকুন্দ সঙ্গে নেই। একলা হাঁটছিল সে। তাই রাস্তাটা ক্রমশ লম্বা হতে লাগল, বাগান পার হয়ে দীঘি পেছনে রেখে রেবতী এগিয়ে চলল।

চমৎকার দোকান করেছে মুকুন্দ। জায়গাটাও সুন্দর। মাথার ওপর এতবড় একটা অশ্বত্থ গাছ আকাশের অনেকটা জুড়ে ডালপালা ছড়িয়ে আছে। তাই ছায়াটা এত গাঢ় ঠাণ্ডা মিষ্টি। পাখি কিচির-মিচির করছে সারাক্ষণ। পাতার সরসর শব্দ হচ্ছে। বাঁশের বেড়া ওপরে টিন দিয়ে মুকুন্দর দোকান। ছুটো ঝাঁপ খুলে দিয়ে ফুটফুটে চেহারার বাচ্চা দোকানদার ডাল নুন লঙ্কা পেঁয়াজের ডালা সাজিয়ে চুপ করে বসে আছে।

কখন খদ্দের আসবে তার কিছু ঠিক নেই।

দোকানের সামনের আঁকা-বাঁকা ধুলোর পথটার দিকে তাকিয়ে থেকে থেকে ছোকরার বুঝি হাই উঠছিল। এক সময় হাই ভেঙে সে উঠে দাঁড়াল, হাত বাড়িয়ে শিকলে ঝুলান পাখির খাঁচাটা নামিয়ে পাখিটাকে ভিতর থেকে টেনে বার করে কোলে নিয়ে সে আদর করতে লাগল। আর সেই মুহূর্তে একটি নতুন মানুষ দোকানে ঢুকল। যেন টকটকে লাল সিল্কের একটা ঝলক দোকানীর চোখে, লাগল, আর সেই সঙ্গে তেল সাবান ক্রিম স্নোর চড়া গন্ধে বাতাসটা ভরে উঠল। কেমন ভ্যাবাচেকা খেয়ে গেল ছোট মানুষটা। চোখ তুলে রেবতীর মুখের দিকে এমন ভাবে তাকিয়ে রইল যেন কি করতে হবে সে ঠিক করতে পারছিল না।

কি হল, খুব অবাক লাগছে বুঝি নতুন খদ্দের দেখে!

রাখাল এবার আর বসে থাকল না, পাখিটাকে খাঁচার ভিতর ঢুকিয়ে চট করে উঠে দাঁড়াল, তারপর তেলের টিন নুনের ভাড় ডিঙিয়ে রেবতীর কাছে ছুটে এসে টিপ করে একটা প্রণাম সেরে নিল।

কিন্তু ভাল করে সে সোজা হয়ে দাঁড়াবার আগেই রেবতী খপ করে হাতটা মুঠোর ভিতর চেপে ধরল।

দেখা হলেই এমন হুটহাট পা ছুঁয়ে পেন্নাম করতে হবে না,

বুঝলে। রেবতীর গলায় একটু শাসনের সুর ছিল একটু ধমক ছিল। মাঠের দিকে চোখ রেখে রাখাল চুপ করে রইল। রেবতী কিন্তু মুঠো আলগা করল না। এবার হেসে বললে, কি হল, পাখি নিয়ে খেলা হচ্ছিল বুঝি?

রাখালের মুখেও এবার একটু হাসি দেখা গেল। রেবতীর দিকে চোখ তুলে ঘাড় কাত করল।

কিন্তু রেবতীর দৃষ্টি খাঁচার পাখির দিকে ছিল না, বাচ্চা দোকানীটির বাঁশীর মতন নাক ফুটফুটে গায়ের রং ও মিশমিশে কালো চোখ দুটো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিল, শুঁয়োপোকার মতন গোঁফের রেখা উঁকি দিয়েছে, বৃষ্টি ধোয়া কচি ঘাসের মতন একমাথা চুল।

পাখি পোষ মেনেছে? রেবতী হঠাৎ প্রশ্ন করল।

এবারেও রাখাল ঘাড় কাত করে হাসল, বলল, হুঁ, অনেকদিন আগেই পোষ মেনেছে।

আমার একটা পাখি পোষার ইচ্ছে হয়।

নেবেন এটা? রাখাল তৎক্ষণাৎ বলে উঠল, এটা আপনি নিয়ে নিন।

রাখালের হাত ছেড়ে দিল রেবতী, আঁচল দিয়ে নিজের কপাল মুছল।

আমায় দিয়ে দিলে তোমার খাঁচা যে শূন্য থাকবে। রেবতী ঠোঁট টিপে হাসল।

উঁহুঁ, রাখাল ব্যস্ত হয়ে মাথা নাড়ল। শূন্য হয়ে থাকবে কেন, আর একটা শালিক ধরব।

বেশ তো, আর একটা পাখি ধরে আমায় দিও, তোমার শালিক তোমার খাঁচায় থাক।

কিন্তু তাতে রাখাল যেন খুব উৎসাহবোধ করল না। বিড়বিড় করে কিছু একটা বলল।

কি হল, পারবে না আর একটা পাখি ধরে দিতে? রেবতী

এবার রাখালের কাঁধে হাত রাখল। আলতো করে সেই সঙ্গে একটা ঝাঁকুনিও দিল।

পারব, শালিক ধরা তেমন আর শক্ত কি, কিন্তু—রাখাল আবার থেমে গেল। রেবতী যেমন তার তরুণ গোঁফের রেখাটি দেখেছিল তেমনি রাখালও এবার সাহস করে চোখ তুলে মনিব-পত্নীর মেঘের মতন কালো চুল পাখির ডানার মতন জোড়া ভুরু টুকটুকে লাল ঠোঁট দেখছিল।

কি বল, চুপ করে রইলে কেন! রেবতী কাঁধ ছেড়ে দিয়ে আবার রাখালের হাত ধরল।

না, বলছিলাম কি, পাখি ধরা সহজ কিন্তু পোষ মানান কঠিন।

রেবতী শব্দ করে হাসল, তাই বুঝি তোমার পোষ মানা শালিকটা আমায় দিয়ে দিতে চাইছ—

রাখাল কথা না বলে ঘাড় নাড়ল।

আমি পারব, কি করে পাখি পোষ মানাতে হয় আমি জানি, তুমি সুন্দর দেখে আমায় একটা শালিক ধরে দিও, হলদে ঠোঁট সাদা বুক মিশমিশে কালো পাখি হওয়া চাই কিন্তু।

হুঁ, পারব, এখন রোদ পড়ে গেছে, সব শালিক বাসায় ঢুকবে, কাল সকালের আগে ওরা বাসা থেকে বেরোবে না, ঠিক ধরে দেব একটা। বাড়ি যেয়ে নিই।

তা তুমি আমায় কি বলে ডাকবে, ঠিক করেছ কিছু?

প্রসঙ্গটা এত অতর্কিতে বদলে যাবে রাখাল ধারণা করতে পারেনি। হাঁ করে আবার কলকাতার মানুষটির মুখ দেখছিল। তার বাবু যে কলকাতার মেয়েছেলে বিয়ে করে এনেছে এটাই তার কাছে সবচেয়ে অভিনব মনে হচ্ছিল। ভয়ানক নতুন একটা জিনিস। বাড়িতে মার সঙ্গে কি সমবয়সী ছেলেদের সঙ্গে এই নিয়ে সে একাধিকবার আলোচনাও করেছে। এবং তার ভিতরে একটা গর্ব ছিল নতুন মানুষটার একেবারে মুখোমুখি হয়ে প্রথম দিনই সে দাঁড়াতে পেরেছিল এবং পা ছুঁয়ে পেন্নাম করতে পেরেছিল। এবং

সেদিন থেকে ক্রমাগত সে ভাবছিল, তাইতো, কি বলে মানুষটিকে ডাকা যায়। প্রতি মুহূর্তে সে আশঙ্কা করছিল, আবার যখন মানুষটির সামনে গিয়ে দাঁড়াবে, তখন সে, প্রথম দিন যেমন হয়েছিল, বিপদে পড়ে যাবে। খুড়িমা কি জেঠিমা ডাকটা কিছুতেই তার মনঃপূত হচ্ছিল না। তার যেন মনে হচ্ছিল এই মানুষটিকে অন্য কিছু ডাকতেই ভাল লাগবে। কিন্তু সেই অন্য কিছুটা কি তা-ও নিজের মনের ভিতর হাতড়ে কিছুতেই খুঁজে বার করতে পারছিল না।

আশঙ্কা অনুযায়ী সেই বিপদটা ঠিক সামনে এসে দাঁড়াতে সে রীতিমত ঘাবড়ে গেল। ঢোক গিলে একবার রেবতীর পায়ের দিকে একবার তার মুখের দিকে ঘনঘন তাকাতে লাগল।

তার এই অসহায় অবস্থাটা রেবতী সেদিনই বুঝতে পেরেছিল। আজও আবার ভ্যাবাচেকা খাওয়া কচি মুখটা দেখে ঠোট টিপে সে হাসতে লাগল।

বাইরে সত্যি তখন রোদ পড়ে গিয়েছিল। মাথার ওপর অশ্বত্থের ডালে অসংখ্য পাখি এসে জমা হয়েছিল। তারা একসঙ্গে কলরব করছিল। দোকানের বাইরে রাস্তাটার আর তেমন ঝকঝকে সাদা চেহারা ছিল না। নিভে আসা বিকেলের আলোয় কেমন মেটেমেটে দেখাচ্ছিল।

তুমি আমায় দিদিমণি বলে ডাকবে। রেবতী এবার তার হাত ছেড়ে দিয়ে থুতনি ধরে একটু নেড়ে দিল। রাখাল ফিক করে হাসল। খুশি হল সে বোঝা গেল। সমস্যাটার যে এত সহজে সমাধান হয়ে যাবে সে হয়তো ভাবতে পারেনি। কিন্তু খুশি যেমন হল তেমনি হঠাৎ একটা লজ্জা একটা সঙ্কোচের ভাবও যেন ছেলেটার চোখে উঁকি দিয়ে তৎক্ষণাৎ আবার মিলিয়ে যেতে দেখল রেবতী। তা তো হবেই। রেবতী তখন মনে মনে চিন্তা করল, যত ছোট করেই সে মুকুন্দর এই কর্মচারীটিকে দেখুক, আসলে সে পুরুষ। যৌবনের ছাপ পড়তে আরম্ভ করেছে চোখে মুখে শরীরে। তার চোখে রেবতী

আজও অপরিচিত একটি মেয়েছেলে—এই অবস্থায় রেবতী হঠাৎ তার থুতনি ধরে আদর করবে—বুকের ভিতর একটু ধাক্কা লাগবার কথা।

রেবতীও অপ্রস্তুত হয়ে গেল। যেন সেও চোখে মুখে ঈষৎ লাল হয়ে উঠল। ঘাড়টা অন্যদিকে ঘুরিয়ে নিল। এবং ডাকাডাকির প্রসঙ্গটা ছেড়ে দিয়ে তৎক্ষণাৎ সে অন্য প্রসঙ্গে চলে গেল।

তোমার দোকানে ডাল নুন পেঁয়াজ লঙ্কা ছাড়া আর কিছু নেই বুঝি?

কেন থাকবে না। রাখাল তৎক্ষণাৎ আঙুল দিয়ে তার মাথার পিছনে কাচ-পরানো ছোট কাঠের আলমারীটা দেখাল। মণিহারী জিনিসও আছে।

তাইতো দেখছি! রেবতী খুশি হয়ে গলাটা আলমারীর দিকে বাড়িয়ে দিল। স্নো ক্রীম পাউডার, মাথার গন্ধ তেল সাবান, আলতা আয়না চুলের রিবন—একটা দুটো করে প্রায় সব রকম জিনিসই দোকানে রাখা হয়েছে। এখানে এসব চলে? বলতে বলতে হাত বাড়িয়ে আলমারীর ডালাটা টেনে রেবতী ভিতর থেকে একটা তেলের শিশি বার করল।

চলে, বিড়বিড় করে রাখাল বলল, কম চলে, তাই বাবু অল্প অল্প করে এসব মাল আনেন। তারপর যখন এ তল্লাটে আরও বেশি বসতি হবে লোক হবে তখন বেশি করে আনবেন।

শিশিটা অরও দু'বার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নেড়েচেড়ে দেখে এবং ওপরের রঙিন লেবেলের লেখাগুলো একটু পড়তে চেষ্টা করে, পরে আবার সেটা আলমারীতে ঢুকিয়ে রাখল।

এটা আপনি নেবেন? নিন না। রাখাল হুট করে বলে বসল।

রেবতী ঘাড় দুলিয়ে সুন্দর করে হাসল।

আমার মাথার তেল যে রয়েছে—এখনো দু'শিশি ঘরে আছে। একটু থেমে থেকে পরে আবার বলল, তোমার বাবু এরচেয়ে অনেক

দামী অনেক ভাল জিনিস আমার জন্য কলকাতা থেকে কিনে এনেছেন।

একটু বুঝি হতাশ হল রাখাল। ছোট একটা নিশ্বাস ফেলল। এ কথার পর আর কি বলা যেতে পারে ভেবে ঠিক করতে পারছিল না যেন সে।

কেন, তোমার দোকান থেকে আমি এক শিশি তেল কিনে নিয়ে গেলে কি খুব খুশি হও।

না তা নয়। রাখাল আবার একটা লাজুক হাসি হাসল। যেন অন্য কথা মনে আছে—আর কিছু বলতে পারলে সে খুশি হয় এমন চোখ করে রেবতীকে দেখতে লাগল।

রেবতী বলল, তা ছাড়া তোমার বাবুর দোকান, তার মানে আমারও দোকান, আমাকে যদি এখান থেকে তেল সাবান স্নো ক্রিম কিছু নিতে হয় তো এমনি নিতে হবে, পয়সা দিয়ে কিনতে হবে না, তাই না?

হুঁ, তা তো বটেই, তা বটে। ব্যস্ত হয়ে রাখাল মাথা নাড়ল এবং পর পর দুবার ঢোক গিলল। আমি বলছিলাম কি—এই পর্যন্ত বলে আর সে অগ্রসর হতে পারল না। থেমে রেবতীর চোখ দুটো দেখতে লাগল।

হুঁ, কি বলছিলে শুনি? রেবতীর কৌতূহল হচ্ছিল তার মনের কথা জানতে। বস্তুত মানুষটাকে সে যুবকের মতন দেখবে কি যেমন আছে—বালক বলে ধরে নেব বুঝতে না পেরে একটু অস্বস্তিবোধ করছিল। কিন্তু মনের ভাব চেপে রেখে ঠোঁটের হাসিটা আর একটু ছড়িয়ে দিয়ে বলল, এসব শস্তা জিনিস দোকান থেকে নিয়ে গেলে তোমার বাবু রাগ করবে, আমায় কিছুতেই মাথায় মুখে মাখতে দেবে না।

তা তো বটেই। রাখাল আর একটা ঢোক গিলল, গাঁয়ের

মানুষদের জন্যে এসব জিনিষ কিছু দোকানে রাখা হয়েছে, আপনার জন্যে বাবু ভাল ভাল তেল সাবান শহর থেকে কিনে আনবেন।

তেল সাবান ক্রিম স্নো শাড়ি জামা জুতো—কোন্‌টা না, অনেক কিছু আনা হয়ে গেছে, আবার দরকার পড়লে আনা হবে।

এক সেকেণ্ড চুপ থেকে কি ভেবে নিয়ে রাখাল পায়ের আঙুলের ওপর ভর দিয়ে আলমারীর মাথার ওপর থেকে একটা ছোট কাঠের বাক্স টেনে নামাল।

—কি আছে এর মধ্যে? রেবতী ঝুঁকে দাঁড়াল। রাখাল কথা বলছিল না। টিপে টিপে হাসছিল। আমার কাছে দাও, আমি খুলে দেখি। রেবতী হাত বাড়িয়ে দিল।

রাখালও তাই চাইছিল। রেবতীর হাতে বাক্সটা তুলে দিল। সে নিজের হাতে খুলে দেখুক এর ভিতরে কেমন অবাক জিনিস লুকোনো আছে।

বাক্সের ডালা খুলে রেবতী অবাক হল না, কিন্তু খুশি হল। পাথরের মালা পাথরের দুল। এক রং না। অনেক রঙের। লাল সবুজ হলুদ ফিরোজা।

কাচের আলমারীতে সাজিয়ে রাখছ না কেন। বলে রেবতী সবচেয়ে লাল রঙের মালাটা হাতে তুলে নিল।

হুঁ, তাই রাখব, বড় আলমারীর ভেতর এসব রাখা সুবিধের হবে না। বাবু একটা শো কেস তৈরী করতে দিয়েছেন। দু একদিনের মধ্যে এসে যাবে। জিনিসগুলি রেবতীর পছন্দ হয়েছে বুঝতে পেরে রাখাল খুশি হল।

'আমাকে এই লালটা মানাবে—তাই না?' রেবতী ঠিক গলায় পরল না, গলার কাছে মালাটা ঝুলিয়ে ধরে রাখালের দিকে তাকাল।

রাখাল মাথা ঝাঁকাল।

সব ক'টাই আপনাকে মানাবে, ফরসা শরীরে সব রং মানায়।

তার কথা শুনে রেবতী খুশি হল।

গাঁয়ের মানুষ কি এসব কিনবে? বাক্সের ওপর ঝুঁকে অন্য মালাগুলি সে দেখতে লাগল।

কিনবে, আস্তে আস্তে কিনবে। গম্ভীর হয়ে রাখাল বলল, শো কেসটা আসুক—যখন সাজিয়ে দোকানের সামনে রাখা হবে রোজ দেখতে দেখতে গাঁয়ের বৌঝিদের কিনতে ইচ্ছে করবে।

—তা বটে, রোজ চোখের সামনে দেখলে কেনার ইচ্ছে হবে বৈকি—কত দাম একটা মালার?

দেড় টাকা, আর দুলের জোড়া বারো আনা করে।

—রেখে দাও। হাতের মালাটা বাক্সে ঢুকিয়ে রাখল রেবতী। সোজা হয়ে দাঁড়াল। সুন্দর জিনিস এনেছেন তোমার বাবু, চলবে, আস্তে আস্তে চলবে।

কিন্তু প্রসঙ্গটা কি এখানেই শেষ হয়ে গেল? রাখালের চোখে মুখে আবার যেন হতাশার ছাপ ঘনিয়ে উঠল।

নিন না, এই লাল মালাটা আপনি নিন, খুব মানাবে আপনাকে। বাক্স থেকে মালাটা তখনি আবার টেনে বার করে রাখাল রেবতীর চোখের সামনে তুলে ধরল।

কিন্তু রেবতী সেটা হাতে নিল না। মালার দিকে তার চোখ ছিল না। কিশোর যুবকের চোখ দুটোই সে বেশি করে দেখছিল।

একটা কেন, সব কটাই আমি নিতে পারি, কেননা সব রকম মালা আমাকে মানাবে। তোমার বাবুর যখন দোকান তখন আমারও দোকান। কিন্তু নিয়ে গেলে তো হবে না, বেচতে আনা হয়েছে, এমনি নিয়ে গেলে দোকানের ক্ষতি হবে, সেটা ঠিক হবে না।

আচ্ছা আপনি নিন না, সব নিতে তো বলছি না, এই একটাই নিন। রেবতীর মুখের কাছে মালাটা এমনভাবে তুলে ধরল রাখাল, যেন তখনি সেটা তার গলায় পরিয়ে দেয়। একটু সম্মতি পেলেই হয়।

রেবতী হাসছিল। ইতস্তত করছিল।

—একটা নিলেও দোকানের ক্ষতি, আমি তো পয়সা দিয়ে নিচ্ছি না।

—পয়সা আপনাকে দিতে হবে না—উঁহুঁ দোকানের ক্ষতি হবে না, ক্ষতি হল কি হল না সেটা আমি দেখব, আপনি মালাটা গলায় পরুন।

—তোমার কথা বুঝতে পারছি না! ঠোঁটে ঠোঁট চেপে রেবতী মুখের হাসিটা রুখল, চোখে একটা কৌতুকের ঝিলিক। বুঝতে সে পেরেছে ঠিকই, কিন্তু না বোঝার ভান করে রাখালের চোখ দুটো দেখল। রাখালও এবার মিটমিট করে হাসছিল। চুপ করে হাসছিল, কথা বলছিল না।

—আমি আপনাকে এটা দিলাম। রাখাল আর ইতস্তত করল না। মালার দাম আমি নিজে থেকে মিটিয়ে দেব—দোকানের ক্ষতি হবে না।

সে কি, তুমি আমাকে উপহার দিচ্ছ! রেবতী একটা গাঢ় নিশ্বাস ফেলল।

রাখাল ঘাড় কাত করল। ঠোঁট ছড়িয়ে হাসল। আমি কি আপনাকে একটা কিছু উপহার দিতে পারি না?

রেবতী আর কথা বলল না। রাখাল তার গলায় পাথরের মালাটা পরিয়ে দিল। বাইরে অন্ধকার হয়ে আসছিল। পাখির কিচিরমিচির অনেক কমে আসছিল, দরজার দিকে ঘাড় ফেরাতে রেবতী দেখতে পেল এক পাল গরু নিয়ে দুটো মানুষ ক্রমশঃ দূরে সরে যাচ্ছে। যেন ধুলোর ঝড় উড়ছিল সেখানটায়।

তোমার দোকানে খদ্দের আসছে না তো? রেবতী রাখালের দিকে মুখ ফেরাল।

—আজ শুক্রুরবারের হাট। যাদের যা কেনার হাট থেকে নিয়ে আসবে। হাটের দিন এই দোকানে তেমন একটা বেচাবিক্রী হয় না।

—সন্ধ্যে হয়ে এল। আর কতক্ষণ দোকান খোলা রাখবে?

হুঁ, এবেলা বন্ধ করে দেব। সন্ধ্যের পর বাবু ঝাঁপ বন্ধ করে দিতে বলেন।

তারপর কি করবে? রেবতী পা বদল করে দাঁড়াল।

বাড়ি যাব।

বাড়ি গিয়ে কি করবে?

শালিক ধরব, আপনাকে একটা শালিক এনে দেবই। রাখাল ফিক ফিক করে হাসল। সেই মুহূর্তে রেবতীর আবার কেমন গোলমাল হয়ে গেল। যেন যুবক না, তরুণ কিশোর না, একটি বাচ্চা ছেলে সামনে দাঁড়িয়ে আছে। রেবতী তার থুতনি ধরে আদর করল।

শালিকটা কিন্তু সুন্দর হওয়া চাই। হলদে ঠোঁট, মিশমিশে কালো পাখা, সাদা বুক।

রাখাল কথা না বলে ঘাড়টা শুধু কাত করল।

রেবতী এক পা এক পা করে দোকান থেকে বেরিয়ে এল। আকাশে তখন তারা ফুটেছে।

মুকুন্দ খুশি হল।

খুব মানিয়েছে। এমন যার গায়ের রং তাকেই ত এ জিনিস মানাবে। হ্যারিকেনটা রেবতীর গলার কাছে তুলে ধরল মুকুন্দ। দুধের মত ধবধবে রং, পাথরের মালা তো নয়, মনে হচ্ছে মুক্তোর মালা পরেছ।

রেবতী একটি পরিতৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলল।

মুকুন্দ হ্যারিকেনটা নিচে নামিয়ে রাখল।

যাক, তুমি যে ওদিকে বেড়াতে গিয়ে আমার দোকানটা দেখে এসেছ, খুশি হয়েছি শুনে। এই ছোট দোকানটার ওপর আমার খুব মায়া।

সুন্দর দোকান হয়েছে! রেবতী বলল, লোকজন বাড়লে বিক্রিটিক্রিটা বাড়বে।

তা বাড়বে। এই জন্যই তো মোড়ের কাছে দোকান করেছি। উৎসাহের গলায় মুকুন্দ বলল, একটা জিনিস তোমার পছন্দ হয়েছে, এটাও আমার কম সৌভাগ্যের কথা না, তাও কিনা একেবারে পয়সা দিয়ে কিনে এনেছ।

পছন্দ হয়েছে, তাই কিনে এনেছি। সস্তা জিনিস বটে—কিন্তু দাম দিয়ে তো সব সময় সব জিনিসের বিচার হয় না।

মুকুন্দ হা-হা করে হেসে উঠল। রেবতীর এ কথায় সে আরো বেশি খুশি হল। কথাটা রেবতীকে এভাবেই বলতে হল। মুকুন্দর দোকানের সেই ছোকরা কর্মচারী যার নাম রাখাল, প্রথম দিন হঠাৎ রেবতীর সঙ্গে আলাপ করার পরই তাকে নিজের পয়সায় একটা পাথরের হার কিনে উপহার দিয়ে বসল—মুকুন্দকে বলতে কেমন সংকোচ লাগল তার।

যাক গে, দোকানটা দেখে এসেছ, খুব ভাল। মুকুন্দ একটা

তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলল। আমি ভেবেছিলাম তোমাকে বলব, এদিক ঘুরে ফিরে আমার দোকানটা, আখ মারার কলটা, বড় রাস্তার ওধারে একটা পাম্প বসিয়েছি, খরার সময় নালার জল সরাসরি মাঠে গিয়ে পড়বে—সবাই এক এক করে তুমি দেখবে। এ সবও তো তোমারই।

রেবতী মিষ্টি করে হাসল।

আখমারা কল জলের পাম্প এখনো দেখা হয়নি, আজ শুধু দোকানটা দেখে এসেছি।

হুঁ, আমি ঠিক সময় করে উঠতে পারছি না—তা না হলে সঙ্গে করে আমি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সবই তোমাকে দেখাতাম, দেখাব, একটু অবসর হয়ে গেলে—

এখন থাক, এখন লাঙলের সময়, তুমি ব্যস্ত—তারপর তোমার সঙ্গে ঘুরে ফিরে সব দেখব। তাড়াহুড়ো করার কিছু নেই—

তাই তো, মানুষটির চমৎকার ব্যবহারে মুকুন্দ ক্রমেই অভিভূত হয়ে যাচ্ছে। প্রথম প্রথম, এই কাল পর্যন্তও একটু অস্থিরতার ভাব ছিল বৈকি রেবতীর। অল্পেতেই কেমন হতাশ হয়ে পড়েছে। মুকুন্দ বাইরে বাইরে থাকছে। আর রেবতী ছটফট করছে। নিজেকে নাকি খুব একলা মনে হয় তার। অস্বাভাবিক না। মুকুন্দ চিন্তা করেছে। নতুন জায়গা, একেবারে অন্য রকম জীবন, জল সইয়ে নেওয়ার মতন পাড়াগাঁর এই দিনগুলি সইয়ে নিতেও দেরি হচ্ছে তার। কিন্তু এক একটা দিন যেমন যাচ্ছে তেমনি সব দেখে শুনে রেবতীও বুঝতে পারছে, উতলা হবার কিছু নেই, অস্থিরতা খামকা। দু-একদিনের জন্য এই সংসারে থাকতে আসেনি সে, সারাজীবন থাকতে হবে, আর মুকুন্দর চাষবাসের কাজ চিরদিনই থাকবে। কাজেই—

তা বলে, রেবতী আবার বলল, তুমি অবসর হলেই যে সব সময় আমাকে নিয়ে ঘুরবে, এখানে ওখানে যেতে আমাকে সঙ্গে নিয়ে বেরোবে সেটি আমি হতে দিচ্ছি না—

কেন শুনি। মুকুন্দ একটু অবাক হল।

কেন, তোমার আগের বউয়ের আমলে এই করে কী সব কথা তোমাকে শুনতে হত ভুলে গেছ?

মুকুন্দ হাসল। ভুলে যাব কেন। সব মনে আছে, চিরকালই মনে থাকবে। বউ নিয়ে বেশি ঘোরাঘুরি করেছি আর লোকে টিটকারী দিয়েছে, বউকে মাথায় করে নাচি, বউ-নেওটা আমি; কত কি বলেছে। সবই শুনেছ আমার মুখে।

রেবতী গম্ভীর। কাজেই আমাকে দিয়ে এরকম বদনাম তোমাকে কিছুতেই কিনতে দেব না।

আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে, না হয় আমার সঙ্গে একটু কমই বেড়াবে। মুখের হাসি ধরে রেখে মুকুন্দ কি যেন ভাবল। তারপর গম্ভীর হয়ে গেল। আসল কথাটা কি জান নয়া বউ, লোকে ভাবত ভালবাসার টানে আমি তাকে নিয়ে এত ঘুরতাম, ভেতরের কারণটা কেউ বুঝত না, জানতও না।

রেবতী হঠাৎ কথা বলল না। চোখের তারা স্থির রেখে মুকুন্দর মুখটা দেখছিল। মুখের হাসি নিবে গিয়ে মুকুন্দর চোখ ধকধক করছিল। বিমলার প্রসঙ্গ উঠলেই অবশ্য মুকুন্দর চোখে আগুন জ্বলতে থাকে। কিন্তু আজ যেন আগুনটা হঠাৎ নতুন করে জ্বলে উঠল। আগুনের শিখাটা মোটা হয়ে দেখা দিল।

খাটের কিনারায় বসে দুজন গল্প করছিল। মুকুন্দ উঠে জানালার ধারে গিয়ে এক দলা থুথু ফেলে এল। বাইরে উঠোনে মুকুন্দর কুকুরটা ডাকছিল। কুকুরটা যখন বেশি ডাকতে থাকে তখন মুকুন্দ আলো নিয়ে একবার বাইরেটা ঘুরে দেখে আসে। নেবুতলার ওদিকে বলাই লম্ফটা হাতে ঝুলিয়ে তার চালাঘরের দোর খুলে বেরিয়ে এসে এদিক ওদিক দেখে—তারপর বাড়ির চারপাশে একটা চক্কর দিয়ে যায়।

এটা অবশ্য বেশি রাত হলে হয়।

কিন্তু এখন রাত বেশি হয়নি। বলাই অবশ্য এ সময় এমনিও

বেরোয় না। এ সময় বুড়ো নাক ডাকিয়ে ঘুমোয়। রাত দুপুর থেকে তার জাগার পালা আরম্ভ হবে।

থুথু ফেলে মুকুন্দ আবার রেবতীর পাশে এসে বসল।

হুঁ, সঙ্গে নিয়ে ঘুরেছি, কাছে কাছে রেখেছি, যখন শিকার করতে বেরিয়েছি তখনো দুষ্টকে বাড়িতে রেখে যাইনি। কেন, এখন বুঝতে পেরেছ?

সন্দেহ করছিলে। একলা বাড়িতে রেখে যেতে সাহস পেতে না। তাই কি?' রেবতী ভুরু কুঁচকাল। মুকুন্দ মাথা নাড়ল।

যেদিন থেকে সতীলক্ষ্মী বউয়ের ভেতরটি বুঝে গেলাম, চরিত্রটা আর অজানা রইল না সেদিন থেকে বউকে সঙ্গে নিয়ে ঘোরার মাত্রাটাও আমি বাড়িয়ে দিলাম, আর লোকে ভাবল—

লোকে অনেক কিছু ভাবে—রেবতী হাতে ভর রেখে শরীরটা একটু পিছনের দিকে হেলিয়ে দিল। তুমি যে সন্দেহ করতে আরম্ভ করেছিল বিমলা কি সেটা বুঝত।

'আমি বুঝতে দেইনি—যেন আমি তাকে কত ভালবাসি, এক দণ্ড চোখের আড়াল হতে দেইনা এমন একটা ভান করে আমাকে চলতে হয়েছে।

এক সেকেণ্ড চিন্তা করে বেরতী পরে হাসল।

আমার মনে হয় তুমি যে তাকে সন্দেহ করছ এটা তাকে বুঝতে দেওয়া উচিত ছিল।

তা হলে কী হত?

হয়তো তখন নিজেকে সে সংশোধন করত, করতে চেষ্টা করত।

মুকুন্দ মথো নাড়ল।

তা তুমি কি করে বলছ, হয়তো তখন আমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করত, দিনরাত ঝগড়া করত।

যাক :গে। এসব জিনিস আলোচনা করতে আমার ভাল লাগে না, সেই ছোকরা কর্মচারী আমায় কী বলল জান?

রাখাল। কী বলল শুনি? প্রসঙ্গটা বদলে যেতে মুকুন্দ যেন খুশিই হল। ছেলেটা ভাল, হুঁ কী বলল তোমাকে রাখাল?

আমায় একটা শালিক ধরে দেবে সে।

হুঁ রাখাল একটা শালিক পুষেছে, তুমি বুঝি তার পোষা পাখিটার খুব প্রশংসা করছিলে?

একটু হেসে রেবতী মাথা নাড়ল।

হুঁ, প্রশংসা করতেই বলল, আপনাকেও একটা শালিক ধরে দেব।

শালিক ধরা তার নেশা। মুকুন্দ এবার অনেকটা নিজের মনে হাসল।

তুমি আমায় একটা খাঁচা এনে দিও। রেবতীর গলায় সুন্দর একটা আব্দারের সুর ছিল।

একটা কেন, তুমি যদি পাখি পুষতে চাও দশটা খাঁচা আমি তোমাকে এনে দেব। রেবতীর হাতটা কোলে টেনে নিল মুকুন্দ।

না, ঐ একটাই ভাল, রাখালের দেওয়া শালিকটাই পুষব। মুকুন্দর কোলের ওপর শরীরটা এলিয়ে দিল রেবতী।

মুকুন্দ কথা না বলে তার মাথাটা বুকে টেনে নিল।

বলাইর মত এ বাড়িতে আরো একটি ছুটি পুরোনো মানুষ আছে। কিন্তু তাঁদের যেন চোখে দেখা যায় না। বোঝা যায় না কোথায় কোন আনাচে কানাচে তারা চলাফেরা করছে নিশ্বাস ফেলছে চোখ মেলে তাকিয়ে অন্য মানুষদের হাঁটাচলা দেখছে বা কান পেতে তাদের কথা শুনছে। এক এক সময় মনে হয় সেই একটি ছুটি সাবেকী মানুষ বুঝি এ বাড়ির পুরোনো তেঁতুল গাছটার মতন কি গাব গাছ ছুটোর মতন। বছরের পর বছর বাড়ির পিছনে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে।

ছায়ার মতন বাড়ির পিছনের দিকেই এই একটি ছুটি মানুষকে কখনো সখনো দেখা যায়। মুখে শব্দ নেই, কানে যাবার মত তেমন একটা কথা বলা নেই। বাড়ির অন্দরের দিকে তাদের কেউ দেখেছে বলে মনে করতে পারে না। অর্থাৎ এই একটি ছুটি মানুষ যে বাড়িতে আছে তাও যেন কারো নজরে পড়ে না।

তাদের উপস্থিতি বা অনুপস্থিতি, সবটাই এবাড়ির আর সব মানুষদের অগোচরে থেকে যায়।

কিন্তু তারা ঠিক দেখছে, অনুভব করছে। এ বাড়ির প্রত্যেকটা মানুষের নাড়ি নক্ষত্র তাদের মুখস্ত। এ বাড়ির মানুষের রক্তের চাপ শ্বাসপ্রশ্বাসের গতিবিধি চোখ বুজে তারা বলে দিতে পারে।

এমন একটি মানুষ—মানুষ গাছ পৌরাণিক প্রাণী—যা হোক একটা কিছু আখ্যা দেওয়া চলে কুসুমের মাকে। কখানা হাড় জিরজির করছে। মাংসের ছিটেফোঁটা কোথাও লেগে নেই। হাড়ের ওপর একটা শুকনো ধূসর চামড়া ঝুলছে কেবল। আর শনের নুড়ির মতন ক'গাছা চুল এখনো মাথায় টিঁকে আছে, যেন যে কোনদিন একটা দমকা হাওয়া লাগলে সেই ক'গাছাও উড়ে যাবে, কোথায় হারিয়ে যাবে তার কিছু ঠিক নেই। কেমন চোখের কাজ বা ভুরুর

এক গাছা চুল আর অবশিষ্ট নেই, যেমন হাত পায়ের আঙুলের সব কটা নখ মরে হেজে শেষ হয়েছে। যেমন এই মুখে কোনোদিন দাঁত কেউ কল্পনা করতে পারে না। সারা শরীরে থাকবার মধ্যে আছে দুটো চোখ, এই দুটিই জীবন্ত জাগ্রত। সারাক্ষণ জ্বলজ্বল করছে। এবং বিশ্বাস করা যায় না এমন একটা জীর্ণ প্রাচীন শরীরে আজও এক জোড়া চোখের এত তেজ থাকতে পারে। যেন বছরের পর বছর ঐ চোখ দুটো দিয়ে থুত্থুড়ে বুড়ি এ বাড়ির সব গন্ধ আলো অন্ধকার নিদ্রা জাগরণ হাসি কান্না শোক তাপ লেহন করে চলেছে। কিছুই তার চোখে ফাঁকি দেবার উপায় নেই। অথচ তাকে কেউ দেখছে না। গোয়াল ঘর পার হয়ে নেবুতলার ধানের গোলা ছাড়িয়ে কুল ও মানের ঝোপ শেষ হয়ে যেখানে পাহাড়ের মতন উঁচু হয়ে আছে গোবরের টাল, কুসুমের মার রাজত্ব সেখানে।

শীত গ্রীষ্ম বর্ষা—যে কোনো ঋতুর যে-কোনো দিন সকাল দুপুর সন্ধ্যা, যখন ইচ্ছা, কেউ যদি সেখানে গিয়ে উঁকি দেয় তো দেখতে পাবে কুসুমের মা শুকনো ঝনঝনে দুটো হাড়ের কাঠি নেড়ে গোবর ছানছে। আঙুলগুলি গোবরে মাখামাখি হয়ে হাত দুটোকে আর হাত বলে চেনা যায় না।

কুসুমের মা সকালে ঘুঁটে দিচ্ছে, দুপুরে, ঘুটঘুটে সন্ধ্যায়ও দেখা যাবে চুপ করে বসে নিজের কাজ নিয়ে ব্যস্ত। অথচ জায়গাটায় মশা ডাশ এবং দশ রকমের পোকা মাকড়ের রাজত্ব। পচা গোবরের ভিতর পোকা, এত বড় এক একটা শুয়ো পোকা, নয়তো দেখা যাবে লাল দগদগে তেঁতুলে বিছা বেরিয়ে আসছে।

তাই তো বিছার বিষ, মশার কামড় বুড়ি বড় একটা গ্রাহ্য করে কি না! মাংস থাকলে তো হুল ফোটাবে, ভিতরে কলকলে রক্ত থাকলে তো বিষের ক্রিয়া হবে। কাজেই কুসুমের মা নিশ্চিন্ত নির্বিকার।

হুঁ, বর্ষা আরম্ভ হলে ঘুঁটে গলে যায় গোবর জল হয়ে যায়।

কুসুমের মা তার ওষুধ জানে। পাশে এতবড় একটা মানের জঙ্গল আছে কেন। বঁটি দিয়ে মানপাতা কেটে এনে ঘুঁটের ওপর বিছিয়ে দেয়। মান পাতার ছাতার ঢাকনা দিয়ে গোবর ছানে। বৃষ্টি আমার কচু করবে, বুড়ির মনের ভাবটা তখন এ রকম দাঁড়ায়। মানকচু যার বন্ধু তার আবার বৃষ্টির ভয়। রাত্রে বুড়ি গোবর ছানে, হুঁ যেদিন চাঁদের আলো চিকচিক করে সেদিন তো কথাই নেই।

সেই বুড়ি, ঈশ্বর জানে, কেমন করে যেন মানের ঝোপের ভিতর দিয়ে কুলের জঙ্গলের ফাঁক দিয়ে নেবুতলার ধারে গোলার আড়াল থাকা সত্ত্বেও এবাড়ির উঠানে কে হাঁটাচলা করে, রান্নাঘরে কে বসে আছে শোবার ঘরের জানালায় কে দাঁড়িয়ে, সব দেখতে পায়। বাড়ির ভিতর কখন কি সব হয়, কিসের গন্ধ ছড়িয়ে পড়ে এতদূর থেকেও বুড়িকে ফাঁকি দেবার, এড়াবার উপায় নেই? বুড়ি সব টের পায়।

সেদিন সকাল হতে মুকুন্দর দোকানের সেই ছোকরা কর্মচারী রাখাল মিশমিশে কালো রঙের একটা শালিক নিয়ে বাড়িতে ঢুকল। কেবল কি শালিক, চমৎকার একটা খাঁচাও সঙ্গে নিয়ে এল। রেবতী খুশি হল। হুঁ, যেমনটি সে চেয়েছিল। কুচকুচে কালো গায়ের রং, বুকটা সাদা, ঠোঁট এবং পা দুটোর রং এত হলুদ যে সেই রঙের মধ্যে কোন খাদ ছিল না। যেন কেউ কাঁচা হলুদ বেটে শালিকের ঠোঁটে পায়ে এই মাত্র লাগিয়ে দিয়েছে মনে হচ্ছিল।

খাঁচার ভিতর শালিকটা চুপ করে বসে আছে। রাখাল এক গাল হেসে রেবতীর হাতে যখন খাঁচাটা তুলে দেয় তখন রেবতী এদিক ওদিক চোখ দুটো ঘুরিয়ে দুবার উঠোনটা দেখে নেয়। তারপর দু আঙুলে রাখালের থুতনিটা টিপে দিয়ে তাকে একটু আদর উপহার দেয়।

উঠোন ফাঁকা ছিল। মুকুন্দ বাড়ি নেই। বলাইদাকে নিয়ে সেই কোন্ সকালে সে মাঠে চলে গেছে, তখন ভাল করে রেবতীর বুঝি ঘুমও ভাঙেনি।

এখন ফটফটে রোদ উঠে উঠোন ভরে গেছে। সবে ঘুম থেকে উঠে শোবার ঘরের ভেজানো দোর খুলে রেবতী বাইরে এসে দাঁড়িয়েছিল। এমন সময় হাতে খাঁচা ঝুলিয়ে রাখাল এসে উপস্থিত।

কিন্তু পেট ভরে খাদ্য দিতে হবে। রেবতীর আদর পেয়ে মুখটা একটু লাল করে রাখাল বলল, তা না হলে পাখি মরে যাবে।

কি কি খেতে দেব? রাখালের চোখে ঝকঝকে কালো চোখ দুটো ধরে রেখে রেবতী ঠোঁট টিপে হাসছিল। একটা ফর্দ লিখে দিয়ে যাও তুমি।

নতুন মানুষটার কথা শুনে রাখাল কৌতুক অনুভব করল, মনিব পত্নী যে বেশ রসিকা এটুকু বুঝতে পারার বয়স তার হয়েছিল। তা

ছাড়া ফর্দ কথাটার সঙ্গে সে খুবই পরিচিত। মুদির দোকানের কর্মচারী সে।

হেসে বলল, ফর্দ লিখতে হবে না, মুখে বললেই আপনার মনে থাকবে। হুঁ ভাত খেতে দেবেন রুটি ছিঁড়ে দেবেন, ছাতু দিতে পারেন, আর একটা জিনিস খাওয়াতে হবে—তবে তো তাগড়া হয়ে উঠবে, এখনো বাচ্চা আছে।

শুনে রেবতীর চোখ দুটো গোল হয়ে গিয়েছিল। হাঁস মুর্গি পাঁঠা খাওয়াতে হবে নাকি!

এই ছাখো, আপনি কেবল রগড় করছেন।

রাখালও খুব এক চোট হেসে নিল, তারপর গম্ভীর স্বরে বলল, পোকা মাকড় খাওয়াতে হবে।

কোথায় পাব পোকা মাকড়!

বা রে, এটা কি আপনার কলকাতা শহর—পোকা মাকড়ের অভাব? আঙুল দিয়ে বাড়ির পিছনের কুলের জঙ্গল মানকচুর ঝোপ দেখিয়ে দিল রাখাল। ওদিকটায় গেলেই পোকামাকড় পাবেন।

বেশ তাই দেখব। যেন রেবতী এবার নিশ্চিন্ত হতে পেরেছিল। কিন্তু তার চোখের পলক পড়ছিল না। খাঁচার শালিকের দিকে তেমন একটা দৃষ্টি ছিল কি? রাখালকেই দেখছিল বেশি। রাখালও চোখ তুলে তুলে কম দেখছিল কি সুন্দর মুখখানা। আর দেখছিল ফরসা গলায় তার দেওয়া পাথরের লাল মালাটা মুক্তোর মালা হয়ে কেমন ঝিমমিক করে।

শালিক খাওয়ানোর ব্যাপারটা বুঝি তখন গৌণ হয়ে গিয়েছিল। খাঁচার ভিতর চুপ করে বসে বেচারা শালিক অবাক হয়ে দুটি মানুষকে দেখছিল। মানুষ দুটির চোখে এক ধরনের আগুন দেখছিল সে। শালিকের চোখে এ ধরনের আগুন কখনো দেখেনি।

ভারি বয়সের মানুষটি অল্প বয়সী মানুষটির গাল টিপছিল, থুতনি টিপছিল। অল্প বয়সের মানুষটি ঘনঘন ঢোক গিলছিল আর

কানে মুখে লাল হয়ে উঠছিল। এই জিনিসটা কতক্ষণ চলত কে জানে।

উঠোনে পায়ের শব্দ হতে দুজন এক সঙ্গে চমকে উঠল। এক সঙ্গে দুটি চোখের আগুন নিবে গেল।

হুঁ, পোকামাকড় খেতে দেবেন—দুদিনেই ডাগর হয়ে উঠবে। রাখাল আর একবার উপদেশ দিয়ে বারান্দা থেকে নেমে এল। যেন একটা সকালের মধ্যে সে নিজেও বেশ সাবালক হয়ে উঠেছিল।

মুকুন্দর বাইরের চাকর গঙ্গারাম উঠোন ঝাঁট দিতে এসেছে। রেবতী খাঁচাটা তুলে শালিকটাকে আদর করতে আরম্ভ করল।

দুপুরে ভাত খেতে এসে রেবতীর শালিক দেখে মুকুন্দও কম খুশি হল না। হুঁ, রাখাল ভাল ছেলে, তার যেমন কথা তেমন কাজ। সুন্দর পাখি ধরে এনেছে। এটাকে পোষ মানাতে চেষ্টা কর।

এখনি প্রায় পোষ মেনে গেছে। খিলখিল করে হাসছিল রেবতী।

তা তোমার পাল্লায় পড়েছে যখন পোষ মানতে আর কতক্ষণ।

আহা, রেবতী তৎক্ষণাৎ ঠোঁট বেঁকিয়েছিল। যেন আমি জাদু জানি, মায়াবিনী, সবাইকে কেবল পোয মানিয়ে রাখছি।

সবাইকে রাখছ কিনা জানি না, কিন্তু, আঙুল দিয়ে মুকুন্দ নিজেকে দেখিয়েছিল, এমন জোয়ান জবরদস্ত একটা পুরুষকে শেয়ালদার একটা চায়ের দোকানে বসে দশ মিনিটের মধ্যে পোষ মানিয়ে ফেলেছিলে।

আজ্ঞে না মশাই, দুদিন তিন দিন রাস্তায় ঘুরে ঘুরে তবে একদিন আপনাকে ধরতে পেরেছি, তারপর আবার হারিয়ে গেছেন, আবার হন্যে হয়ে ঘুরে ঘুরে আর একদিন খুজে পেয়েছি—তারপর না একদিন ধরে বেঁধে বৌবাজারের সেই বিদঘুটে কাঠের সিঁড়িওলা বাড়ির চিলেকোঠায় নিয়ে গেলাম, তখন বাবু ধরা দিলেন।

হুঁ, সেদিন ধরা দিয়েছি, কিন্তু ভেতরে ভেতরে পোষ মেনেছিলাম প্রথম দিন দেখা হবার পরই।

বেশ তো! যেন এবার রেবতী সত্যি রাগ করল। আমি মনেপ্রাণে চেয়েছিলাম—তাই সহজে পোষ মেনেছিলে—সবাইকে মনে প্রাণে কোনদিন চাইনি, চাইও না, এবং তাদের কাউকে পোষ মানাবারও আমার দরকার পড়বে না।

আচ্ছা আচ্ছা ঘাট মানছি—বলাটা ভুল হয়েছে, তবে শালিকটা ঠিক ওবেলার মধ্যে পোষ মানবে।

তুমি কি আবার এখনি বেরোবে?

হুঁ, নালার ধারের জমিতে আজ লাঙল পড়েছে। কাছে না থাকলে কাজ এগোবে না।

ভাবলাম আজ দুপুরটা বুঝি বাড়ি থাকবে।

আমার খুব ইচ্ছা করছিল—কিন্তু, মুকুন্দ আমতা আমতা করছিল। তুমি কি চাইছ আজ তবে আর—

না না, কাজের ক্ষতি করে তোমাকে আমি ঘরে থাকতে বলব না। আমি অবুঝ নই। পুরুষের কাজ তো থাকবেই—

মুকুন্দ খুশি হল।

আমি জামি তুমি আমায় একথা বলবে। ইস, জীবনের প্রথম থেকে তোমার মতন একটি ঘরণী পেতাম, আজ আমার সংসারে ধন উপচে পড়ত—একটা বাজে স্ত্রীলোককে বিয়ে করে—

থাক এখন আর এসব বলে লাভ নেই, আবার কোমর বেঁধে লাগ, আবার তোমার সব হবে, দিন শেষ হয়ে যায়নি, এমন কিছু বয়স হয়নি তোমার—

কোকিলটা ডাকছিল। জানালা দিয়ে ফাল্গুনের ঝুরঝুরে হাওয়ার সঙ্গে আমের বোলের গন্ধ ঘরে ছড়িয়ে পড়ছিল। আহ্লাদের আতিশয্যে রেবতীর মুখটা বুকের কাছে টেনে নিয়ে মুকুন্দ গাঢ় করে

একটা চুমু খেল। বিড়বিড় করে বলল, এবার ঘরে লক্ষ্মী এসেছে, আর আমার কোন ভয় নেই, আবার আমার সংসার—

তার মোটা রোমশ আঙুলগুলি মুঠোর ভিতর নিয়ে রেবতী একটু খেলা করল।

বিকেলটা আরো সুন্দর লাগছিল। দিন দিন যেন গাছপালা আকাশ মাটি সুন্দর হচ্ছিল। পাখির শব্দ বাড়ছিল। নানারকম ফল ফুল কুঁড়ি কচিপাতার সঙ্গে বাতাস উত্তাল হয়ে উঠছিল। আর মিষ্টি হাওয়া। যেন শরীরের রক্ত ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছিল বসন্তের এই হাওয়া আর পাখির গান আর কুঁড়ি পাতা ফুলের গন্ধ।

খাঁচা শুদ্ধ শালিকটা হাতে ঝুলিয়ে রেবতী গোয়াল ঘরের পাশ দিয়ে নেবুতলা পার হয়ে একটা কামরাঙ্গা গাছের নিচে এসে দাঁড়াল। রেবতী অবাক হয়ে মাথার ওপরটা দেখছিল। যেন একটা সবুজের ঝালর কে ঝুলিয়ে দিয়েছে আকাশের নিচে। ঝালরের ফাঁক দিয়ে সোনা গলা বিকেলী রোদ ঝরে পড়ছিল রেবতীর চুলে কাঁধে পিঠে।

দৃশ্যটা একটু সময় দেখে আবার সে পা-পা করে এগোতে লাগল। ফড়িং প্রজাপতি বোল্‌তা ভ্রমর—কত কি পতঙ্গ উড়াউড়ি করছিল এই ঝোপ সেই ঝোপের মাথায় মাথায়—শালিকের জন্য পোকামাকড় খুঁজতেই রেবতীর এদিকে আসা। কোনদিন আসেনি। বাড়ির পিছনের এই অংশটার দিকে তেমন ভাল করে চোখ তুলে একদিন সে তাকায়ওনি। আজ তার ভাল লাগছিল। বড় নিরিবিলি, বড় শান্ত।

রেবতী আর একটু এগোল। তারপর থমকে দাঁড়াল। মানের ঝোপ কুল কাঁটার জঙ্গল। জঙ্গলের নিচে একটা মানুষ চুপ করে বসে আছে। প্রথমটা মানুষ বলে বোঝা যায় নি। তারপর রেবতী দেখল ক'খানা হাড় নিয়ে মেয়েমানুষের একটা কাঠামো বটে।

কিন্তু কি তীব্র চাউনী! এমন ভাবে এদিকে তাকিয়ে, যেন রেবতীকে গিলে খাবে।

একটু ভয় পেয়ে রেবতী থমকে দাঁড়াল। যেন আশী নব্বই—আরো বেশি, শ' পেরিয়েছে বুড়ির বয়স। অথচ এত জ্বলজ্বল করছে চোখ দুটো। ক'খানা শুকনো হাড় এবং মাথায় শনের মতন ক'গাছা চুল ছাড়া শরীরে আর কিছু নেই। ছোটবেলায় রেবতী ডাইনী বুড়ির গল্প শুনেছে। এই কি সেই ডাইনী?

রেবতী চলে আসছিল। দরকার নেই তার পোকামাকড়ের। এমন অলুক্ষণে একটা মূর্তি এখানে বসে আছে জানলে কিছুতেই সে একিকে পা- বাড়াত না।

কিন্তু চলে আসবে কি! দাঁত পড়া মাড়ি দুটো ছড়িয়ে দিয়ে বুড়িও এদিকে আসছে। যেন রেবতীর সঙ্গে কথা বলতে চায়। রেবতী দেখল সে যদি ছুটতে আরম্ভ করে তবু বুড়ির সঙ্গে ছুটতে পারবে না। শোলার মতন পাতলা হাড় ক'খানা নিয়ে বুড়ি যেন হাওয়ায় ভেসে আসছিল। যত কাছে আসছে একটা খনখন শব্দ, যেন কেউ একটা ভাঙ্গা কাঁসার থালার গাঢ় লোহার ডাণ্ডা বা এ ধরনের কোন কিছু দিয়ে আঘাত করে আওয়াজ করছে—থুত্থুড়ে বুড়ি এমন বিশ্রী শব্দ করে হাসছিল।

রীতিমত ঘামতে আরম্ভ করছিল রেবতী।

বুড়ি এসে সামনে দাঁড়াল। খলখল করে হাসছে। আর সাপের চোখের মতন ঠাণ্ডা অথচ কেমন জ্বলজ্বলে চোখ দুটো মেলে ধরে রেবতীর মুখ দেখছে গলা দেখছে হাত পা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে। বুড়ি খুব খুশি হয়েছে বোঝা গেল। রেবতীকে কাছে পেয়ে তার যেন আহ্লাদ ধরছিল না।

তা হবে, রেবতী অনুমান করল, এ বাড়ি সে নতুন এসেছে—কোনদিন এই ঝোপঝাড়ের কাছে আসেনি। বুড়ি হয়তো ভেবেছে রেবতী তার সঙ্গে কথা বলতে এদিকে আজ পা বাড়িয়েছে। নিশ্চয়

বাড়ির ভিতর ঢুকতে নিষেধ আছে বুড়ির। নীচ জাতের মানুষ হয়তো। আজ বাড়ির নতুন বউ তার চৌহদ্দীর মধ্যে এসে পড়ল দেখে বুড়ির আহ্লাদ ধরছে না। বাড়ির গিন্নীর সঙ্গে আলাপ করার সুযোগ পেয়ে পড়িমরি করে কাছে ছুটে এল।

তোমার নাম কি, অগত্যা বেরতীকে কথা বলতে হল। এখানে কি কর? যদি একটা দুটো কথা বলে জায়গাটা থেকে সে সরে আসতে পারে। ঠাণ্ডা জ্বলজ্বলে চোখ দুটো রেবতীর খারাপ লাগছিল। তার ওপর এমন বিদঘুটে গলার হাসি।

আমার নাম কুসুমের মা। হাসি থামিয়ে বুড়ি বলল।

এখানে বসে বসে কী করছ? রেবতী ফের প্রশ্ন করল।

ঐ যে দিদিমণি আমার কারখানা। কারখানা শব্দটা শুনে রেবতী চমকে উঠল। তারপর বুড়ি যেদিকে আঙুল দেখাল সেদিকে সে চোখ ফেরাল। এবার রেবতী ঠোট টিপে হাসল। বুড়ি রসিকা বটে। গোবরের ঢিবি আর ঘুঁটের টাল দেখে সে বুঝতে পারল কিসের কারখানা। হুঁ, কারখানাই খুলে বসেছে বুড়ি। এক জায়গায় এত ঘুঁটে রেবতী জীবনে দেখেনি।

এত ঘুঁটে দিয়ে কি হবে! যেন অনেকটা নিজের মনে রেবতী বলে ফেলল। বুড়ি শুনতে পেল। সঙ্গে সঙ্গে হাসির মাত্রাটা বাড়িয়ে দিল।

দিদিমনির কথা শোন, একটাও পড়ে থাকবে না, সব এসে তুলে নিয়ে যাবে হাটুরেরা।

ভাল। যেন আর কথা বলার দরকার নেই, রেবতী পা তুলেছিল ঘুরে দাঁড়াবার জন্য।

বুড়ি বাধা দিল।

নতুন দিদিমণিকে এখানে দেখতে পাব ভাবিনি, আমার কপালটা ভাল।

হুঁ, শালিকের জন্য পোকামাকড় ধরতে এসেছিলাম, একটু থেমে রেবতী বলল, পারবে কিছু পোকাটোকা ধরে দিতে?

বুড়ি ঘাড় কাত করল।

কেন পারব মা গো ভাল মানুষের বেটি—আমাদের কি আর কষ্ট গায়ে বাজে—গোবরের টালে গিয়ে যখন বসব, গায়ে এসে হাজারটা পোকা কিলবিল করবে না! হুঁ, শুঁয়োপোকা গুবরে পোকা তেঁতুল বিছে—কত পোকা চাও তুমি।

শুনে রেবতীর গা শিরশির করে উঠল।

ঠিক আছে তোমায় আর ভাবতে হবে না দিদিমণি। গঙ্গারাম একবার ইদিকে আসবে আমার কাছে ঘুঁটে নিতে। তোমার শালিকের জন্য এত এত পোকা ধরে কচুপাতায় মুড়ে রাখব তারপর গঙ্গাকে দিয়ে পাঠিয়ে দেব। কত পোকা খাবে তোমার একরত্তি ওই শালিক!

তাই দিও। রেবতী খুশি হল। চলি এবার—ঘুরে দাঁড়াবার জন্য আবার সে পা তুলবে, বুড়ি বাধা দিল।

আহা নতুন দিদিমণি তবু ঝোপঝাড়ের কাছে একবার এল, এই ঘাটের মড়ার সঙ্গে দুটো কথা বললে, শরীরটা জুড়িয়ে গেল।

কেন, আর কি তোমার কাছে কেউ আসে না?

কে আসবে গো দিদিমণি, বাড়িতে আর মেয়েছেলে আছে নাকি যে আবাগীর সাথে এসে দুটো ভালমন্দ কথা বলবে, সব তো বেটাছেলে, গঙ্গা একবারটি করে এসে ঘুঁটে নিয়ে যায়—উঁহু, এ বাড়ির আর একটা মুনিষ্যের ছায়া এখানে পড়ে না—

হঠাৎ কৌতূহলটা চাপতে পারল না রেবতী।

তোমার আগের দিদিমণিকে দেখেছিলে?

হুঁ। বুড়ি একটা লম্বা নিশ্বাস ফেলল। দেখতে দেখতে চোখে কালি পড়ে গিয়েছিল না! তাই আর দেখতাম না, আর ওই উঠোনের দিকে তাকাতাম না।

তাই তো—রেবতী ঘাড় ফিরিয়ে দেখল ডালপালার ফাঁক দিয়ে এখান থেকে উঠোনটা বেশ দেখা যায়।

কিন্তু তিনি আসেননি ভুল করে এই ঝোপঝাড়ের কাছে। গোবরের টালের কাছে আসবেন লবাবের বেটি আর আমার মতন এই ঘাটের মরার সাথে কথা বলবেন—তবেই হয়েছিল আর কি। বুড়ি নাকের একটা শব্দ করল। অংকারে মাটিতে পা পড়ত না লবারের বেটির।

রেবতী চুপ করে রইল।

তা ওই আমাদের বেটা আহ্লাদ দিয়ে দিয়ে না লবাবের ঝিকে এমন করে দিল। কথায় আছে না, আদরে আদরে বেটি নটী হয়, দেমাকে মাটিতে পা ফেলত না, অংকারে কারো সঙ্গে কথা বলত না রাজরাণী। হুঁ, তারপর তো দেখলাম কেমন চরিত্রের মেয়েমানুষ তুই। চলি। আর এসব শুনতে ইচ্ছা ছিল না রেবতীর, একটা মানুষ কুলে কালি দিয়ে চলে গেছে, এই ইতিহাস এর ওর মুখে শুনে কি হবে।

উঁহু একটু দাঁড়াও, তোমাকে বড় ভাল লাগল গো দিদিমণি, আহা কি মিষ্টি মুখখানা, কি মিষ্টি স্বভাব—বুড়ি হঠাৎ কি ভেবে, মুখটা ঘুরিয়ে এদিক ওদিক দেখে, তারপর প্রায় রেবতীর কানের কাছে গলাটা বাড়িয়ে দিল। বলছিলাম কি দিদিমণি, তোমায় তো দেখছি বেটা একখানা পাথরের মালা কিনে দিল, আর ওই রাজরাণীর গায়ে সোনাদানা ধরত না, ঝিকমিক করত সারা অঙ্গ।

চোখ বড় করে রেবতী কথা শুনছিল।

হুঁ, তারপর মাগীর চরিত্তির যখন সন্দ করল বেটা, তখন গায়ের সব সোনাদানা টান মেরে খুলে নিয়ে সিন্দুকে তুলে রাখল, আর একখানাও পরতে দিল না লবাবের বেটিকে। কথা শেষ করে বুড়ি খলখল করে হেসে উঠল।

রেবতী চমকে উঠল। ঠাণ্ডা অথচ জ্বলজ্বলে চোখ দুটো রেবতীর

মুখের ওপর মেলে ধরে বুড়ি এভাবে হাসে কেন। আগের বউয়ের সব গয়না মুকুন্দ সিন্দুকে তুলে রেখেছে তাই? তা তুলে তো রাখবেই, যদি সব নিয়ে বিমলা পালিয়ে যেত?

উঁহু, বলছিলাম কি দিদিমনি, একখানা কেবল পাথরের মালা গলায় ঝুলিয়ে দিল আমাদের বেটা, সোনা দানা দিল কই, সিন্দুক ভর্তি এত এত গয়না।

আচ্ছা চলি এখন, আবার আসব। এক রকম জোর করে রেবতী ঘুরে দাঁড়াল। কিন্তু বুড়ি যেন নাছোড়বান্দা। রেবতী হাঁটে, বুড়ি পিছনে পিছনে আসে।

উঁহু, বেটাকে বলবে আমায় সোনাদানা দাও, গায়ে গয়না না থাকলে এতবড় বাড়ির বউকে মানায়!

রেবতী এবার ছুটতে আরম্ভ করল। তার কপালের রগ দুটো দপদপ করছিল। কানে যেন আগুনের হল্কা লাগছিল। বুড়ি অবশ্য আর এগোল না, কামরাঙ্গা গাছের ওদিকে ঠিক দাঁড়িয়ে রইল।

এখনও যেন হৃৎপিণ্ডটা ঢুবঢুব করে শব্দ করছে, কপালের রগ দুটো লাফাচ্ছে। খাটের কিনারায় পা ঝুলিয়ে কতক্ষণ চুপ করে বসে রইল সে। বাইরে থেকে এসে ঘরের ভিতরটা অন্ধকার অন্ধকার লাগছিল। না কি চোখটাই এমন ঝাপসা হয়ে গিয়েছিল। অথচ পশ্চিমের জানলায় রক্তের মতন টলটলে এক আঁজলা রোদ গড়িয়ে পড়েছে। বাইরে সবুজ পাতার ঝালর ফাল্গুনের বাতাসে থিরথির কাঁপছিল। স্থির চোখ মেলে রেবতী সব দেখল। তারপর ঘরের ভিতর দৃষ্টি ফিরিয়ে আনল। এবার সে আলমারীর পিছনে কালো তোরঙ্গটা দেখতে পেল, ওপাশে সিন্দুকটা দেখল, আরো কিছু বাক্স পেটারা তার চোখে পড়ল। সব কটা তালার ওপর ধূলো জমে আছে। কতকাল তালা খোলা হয় না। হুঁ, ওটার মধ্যে পাথরের থালা গেলাস সন্দেশের ছাঁচ, ওটার ভিতর তামা কাঁসা। ওটার ভিতর? নিশ্চয় মুকুন্দর মার আমলের খন্তা কড়াই সাঁড়াশী বেড়ি এবং আরো পাঁচ রকমের লোহার জিনিসে বোঝাই হয়ে আছে।

না, এখন সংসার ছোট হয়ে গেছে, এত সব জিনিস বার করে করবে কি। তাছাড়া সাবেকী আমলের বাসন কোসন—বড় হবে ভারি হবে—সর্বদা তোলা টানা মাজা ঘষা, নিত্য ব্যবহার করার অসুবিধা কত।

একটা ভারী নিশ্বাস বুক ঠেলে উঠে এল রেবতীর। পায়ের কাছে শালিকের খাঁচা পড়ে রইল। একবার ভুল করেও আর সেদিকে তাকাল না সে। অথচ পাখিটা চুপ করে টলটল চোখে রেবতীকে দেখছে। অন্য সময় হলে খাঁচা খুলে পাখিটাকে বার করে কোলে নিয়ে সে আদর করতে আরম্ভ করত।

শালিকের কথা ভুলে গিয়ে রেবতী হাত বাড়িয়ে টেবিল থেকে আরসিটা টেনে আনল। তারপর আরসির ভিতর মুখটা

দেখল। দেখে আরসি নামিয়ে রাখল। দু কানে দুটো ফুল, সরষে ফুলের চেয়েও ছোট, দু আনার বেশি সোনা নেই, গলায় একটা সরু চেন। বছরের পর বছর ব্যবহার করে করে এত পাতলা হয়ে গেছে যে কোনদিন হাতের টান লেগে কি চুলের সঙ্গে জড়িয়ে গিয়ে একটু টান পড়লে ছিঁড়ে যেতে পারে। কতবার ছিঁড়েও গেছে। আট আনা সোনার তৈরী এই চেন, কর্মকারের দোকানে গিয়ে রেবতী জোড়া দিয়ে দিয়ে এসেছে। কত বছর হয়ে গেল দশ আনা সোনার ওইটুকুন গয়না গায়ে নিয়ে রেবতী বেঁচে আছে। আর সে সোনা চায়নি, সোনার গয়নার কথা ভাবেওনি। দেশে থাকতে হাবুলের ব বা ঐ দুটো জিনিস অতি কষ্টে গড়িয়ে দিয়েছিল। তখনই দিন চলছিল না, রুজি-রোজগার তেমন কিছু ছিল না হাবুলের বাবার, তা হলেও বউকে দুটো সোনার জিনিস গড়িয়ে দিতে আঁকু-পাঁকু করত মানুষটা। তারপর জিনিস দু'টো গড়িয়ে দিতে পেরে একদিন কত খুশি হয়েছিল। রেবতীও খুশি হয়েছিল।

আজ হঠাৎ সব মনে পড়ে তার চোখে জল এল।

হাতের দিকে চোখ পড়ল রেবতীর। আগে কাচের চুড়ি ছিল। এখন প্ল্যাস্টিকের চুড়ি। হাতে কোনদিন সোনা পরতে পারেনি।

না না, কোনদিন সে সোনা পরতে চায়নি, সোনার কথা ভাবেনি, আজ হঠাৎ কামরাঙ্গা তলায় ঐ বুড়ি তার কানে কি বিষ ঢেলে দিল!

তার ইচ্ছা করছিল ছুটে গিয়ে বুড়িকে ক'ঘা বসিয়ে দিয়ে আসে।

আরসিটা তুলে নিয়ে সে নিজের মুখটা আবার দেখল, গলা দেখল, গলায় পাথরের মালা দেখে বুড়ি এমন বিশ্রী খনখন শব্দ করে হাসছিল।

কিন্তু এ মালা মুকুন্দ দেয়নি। যে দিয়েছে সে ভালবেসে দিয়েছে, আদর করে দিয়েছে। এই মালার তো দোষ নেই। ঠোঁটের কাছে মালাটা তুলে রেবতী একটা চুমু খেল। ফুটফুটে একটা সুন্দর মুখ

তার চোখের সামনে ভেসে উঠল। আরসিটা নমিয়ে যেন চোখ বুঁজে সেই মুখটা আরো কতক্ষণ ধ্যান করল।

তাতে কাজ হল, সুফল পেল সে। যেন ক্ষতের ওপর একটা মলমের প্রলেপ পড়ল, যন্ত্রণাটা কমল। এবার নুয়ে খাঁচা খুলে শালিকটাকে টেনে বার করল। তারপর কোলে নিয়ে ঠোঁটে মাথায় বার বার চুমু খেল।

এবং সে নিজেও অবাক হল, মুকুন্দ যখন বাড়ি ফিরল তখন যন্ত্রণাটা আর একটুও রইল না। তার ভিতর যে কোনরকম ক্ষত আছে একবারও মনে পড়ল না।

মুকুন্দকে চা করে দিল, খাবার খেতে দিল। তুজনে বসে গল্প করল। তখন চাঁদ উঠছিল। ফুরফুরে হাওয়া দিচ্ছিল। কেবল ঘরে বসে গল্প করে তারা তৃপ্তি পেল না। বেরিয়ে দীঘির ধারের চাতালে গিয়ে বসল তুজন।

না, এমনটা হতেই পারে না, রেবতী একসময় চিন্তা করল, মুকুন্দ তাকে ধানের কথা শোনাচ্ছে পাটের কথা শোনাচ্ছে, পুকুরের মাছ, বাগানের ফল গরু ছাগল হাঁস মুর্গি, এক কথায় আরও ক'বিঘা ধানের জমি কেনা হবে, বাড়ির বড় ঘরটার টিন ফেলে দিয়ে কংক্রীটের ছাদ দিলে ভাল কিনা—কত রকম গল্প করছে সে, সবই রেবতীর জন্য, তার সুখের কথা ভেবে, বার বার তা-ও তাকে শোনাতে এতটুকু ইতস্তত করছে না দ্বিধা করছে না—আর সেই মানুষ কিনা ক'পদ সোনার গয়নার কথা লুকিয়ে রাখছে, রেবতীকে তার আভাস পর্যন্ত দিচ্ছে না—রেবতী কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছিল না।

মনে মনে সে ঠিক করল কাল এক ফাঁকে কামরাঙ্গা তলায় গিয়ে বুড়িকে তু'ঘা ঠিক বসিয়ে দিয়ে আসবে। যেমন মিথ্যা কথা বানিয়ে বলেছে। ছোট জাতের মেয়েছেলে। চার পাঁচ কুড়ি বয়স হলে হবে কি, একটা মানুষের নিন্দা গেয়ে আর একটা মানুষের কানে বিষ

ঢেলে দিতে এখনও সময় পাচ্ছে শক্তি পায়, উৎসাহ পায়। রেবতীর গলায় পাথরের মালা দেখে কেমন খলখল করে হাসছিল, তারপরই বিমলার গায়ের গয়না নিয়ে মুকুন্দকে নিয়ে চমৎকার একটা গল্প তৈরি করে শুনিয়ে দিল।

তাহলেও রাত্রে শুতে গিয়ে রেবতীর কেমন কৌতূহল হচ্ছিল, একটু যেন খোঁচা দেবার ইচ্ছা মুকুন্দকে। বলল, কই, তোমার মায়ের আমলের তামা কাঁসার জিনিসগুলো দেখালে না তো?

ঐ ছাখো—সিন্দুকের চাবিটা বলাইদার কাছ থেকে চেয়ে রাখব, কেমন ভুলে যাচ্ছি। মুকুন্দর গলায় একটু অস্বস্তি ছিল।

আর কালো বাক্সটার ভেতর কত সব নাকি পাথরের জিনিস—বলছিলে সেদিন?

হুঁ, তাও দেখাব। ওই বাক্সের চাবিটাও চেয়ে আনতে হবে।

একটু চুপ থেকে রেবতী চাপা গলায় হাসল।

হাসছ কেন? ঘরের আবছা অন্ধকারেও যেন মুকুন্দকে বেশ একটু বিব্রত দেখাচ্ছিল। কেন জানি হঠাৎ একটা কথা কাল দুপুরে মনে পড়েছিল। রেবতীর হাসি আর চাপা থাকল না, রীতিমত খুকখুক শব্দ হল।

আশ্চর্য। মুকুন্দ বিড়বিড় করে উঠল। এমন কি কথা তোমার মনে পড়ল কাল দুপুরে—আমাকে বলতে যদি আপত্তি না থাকে—কথাটা কী নিয়ে ঠিক—হঠাৎ এত হাসি।

হি-হি—রেবতী হাসতে হাসতে এবার বিছানায় গড়িয়ে পড়ল। জোড়া খাটের ওপর দুধের মতো ধবধবে বিছানা। জানালা দিয়ে দুধের সরের মতন জ্যোৎস্না এসে পড়েছে চাদরে বালিশে। রেবতীর খোপা খুলে গেল হাসির ধমকে। চাঁদের আলোয় কালো চুলের রাশ ঝিক্‌মিক্ করে উঠল, যেন তার চোখের কালো তারা দুটোও পরিষ্কার দেখতে পেল মুকুন্দ। হাসির সঙ্গে কি চোখে জল এসে

গেল। বড় বেশি চিকচিক করছে না চোখ দুটো? ফরসা সুন্দর মুখটার ওপর মুকুন্দ ঝুঁকে পড়ল।

কি হল। হেসে চোখের জল নিয়ে এলে—ব্যাপার কি, আমাকে কিছুই বলছ না। রেবতীর মুখের ভিতর আঙ্গুল গুঁজে দিল মুকুন্দ।

মুকুন্দ গায়ে হাত দেবার সঙ্গে সঙ্গে রেবতীর হাসিটাও হঠাৎ থেমে গেল।

বলো, কাতর হয়ে উঠল মুকুন্দ। কথাটা না শোনা পর্যন্ত আমার খুব খারাপ লাগছে, অস্বস্তি লাগছে। রেবতী কথা বলছিল না। দু'হাতে মুখ ঢেকে স্থির স্তব্ধ হয়ে রইল।

মুকুন্দ আর ঝুঁকে থাকল না। সোজা হয়ে বসল। যেন জ্যোৎস্নার বান ডাকছিল তখন। জানালার ওপারে নিশুতি রাত রী-রী করছিল। চাঁদের আলো আর ফুলের গন্ধ ছাড়া পৃথিবীতে আর কিছু আছে বলে মনে হচ্ছিল না।

কি হল চুপ করে রইলে কেন। এবার মুকুন্দর একটু বিরক্ত ভাব। রেবতী তেমনি ফিক ফিক করে হাসে।

না, না, কিছু না এমনি বলছিলাম, কোন কথা আমার মনে হয়নি।

তা হয় না, তা হতে পারে না। মুকুন্দ—রেবতী অবাক হল, কেমন যেন রুক্ষ হয়ে উঠল। তার এমন মূর্তি এর আগে আর সে দেখেনি। একটা ঢোক গিলল রেবতী, একটু গম্ভীর হয়ে আস্তে আস্তে বলল, সত্যি। আমার কিছু মনে হয়নি, তোমায় এমনি বলছিলাম। ঠাট্টা করছিলাম।

তুমি কি কারো কাছে কিছু শুনেছ! চোখ দুটো ছোট হয়ে গেল মুকুন্দর।

না তো! রেবতী চমকে উঠল। কী আমি শুনব, কে আমায় কী বলবে।

আমার কথা? এবাড়ির কথা?

কিছু না, তোমার গা ছুঁয়ে বলছি কেউ আমাকে কিছু বলেনি। সকালে রাখাল আমাকে পাখিটা দিয়ে গেল, সঙ্গে একটা খাঁচাও সে নিয়ে এসেছিল—সব তোমাকে বলেছি। তারপর সারাদিন আমি শালিক নিয়ে রইলাম। কারো সঙ্গে কোন কথাই হয়নি।

তা এমন করে তুমি হাসছিলে কেন?

তোমার মন দেখছিলাম। মুকুন্দর একটা হাত কোলে টেনে নিল রেবতী। তুমি এমন চঞ্চল হয়ে উঠলে।

জানালার বাইরে চোখ রেখে মুকুন্দ চুপ করে রইল।

রেবতী বলল, তোমার সঙ্গে লুকোছাপা করার তো কিছু নেই।

না তা নেই—থাকা উচিত নয়। মুকুন্দ এদিকে চোখ ফেরাল। তোমার সঙ্গে যদি কারো কোন কথা হয়ে থাকে, কারো মুখে কিছু শুনে থাক, আমাকে সঙ্গে সঙ্গে বলবে। মনের কথা চেপে রাখার মতন অশান্তি কিছুই নেই।

না না, আমায় কেউ কিছু বলেনি। রেবতী নতুন করে হাসল। কেউ কিছু বলে নি, তবে দুপুরে যখন ঘর গুছোচ্ছিলাম তখন তোমার ওই তালা বন্ধ তোরঙ্গ আর সিন্দুক দেখে হঠাৎ ভাবলাম, এত যত্ন করে ওই দুটো কোণার দিকে সরিয়ে রাখা হয়েছে, কি জানি, ভেতরে বুঝি অনেক সোনাদানা লুকোনো রয়েছে—

কথাটা ভাল করে শেষ করল না রেবতী, মুকুন্দ ভায়নক শব্দ করে হেসে উঠল। জোয়ান দবরদস্ত পুরুষ। যেন তার হাসির ধমকে খাটটা কেঁপে উঠল। যেন হাসির ঢেউ দেওয়ালে বাড়ি খেয়ে টিনের চালের কাছে উঠে গুমগুম শব্দ করতে লাগল।

ভিতর বাড়ির উঠোনে কুকুরটা দুবার ডেকে উঠল।

এত হাসছ। রেবতী অবাক।

তোমার ছেলেমানুষী ভাবনা দেখে। মুকুন্দ তখনও গুজগুজ করে হাসছিল, সোনাদানা কেউ ঘরে রাখে?

কোথায় রাখে? রেবতী হুট করে প্রশ্ন করে বসল।

মুকুন্দ এক সেকেণ্ড তার চোখ দুটো দেখল, তারপর গম্ভীর হয়ে বলল, আগের কালের মানুষ মাটির নিচে লুকিয়ে রাখত, এখন ব্যাঙ্কে রাখে।

না, আমি বললাম তো, তেমন করে কিছু ভাবিনি, কেন না, আমার তো জানা আছে, তোমার মায়ের আমলের তামাকাঁসা আর পাথরের জিনিসে ওই দুটো ·বোঝাই হয়ে আছে—ভাবলাম আজও বুঝি কোন কোন মানুষ এভাবে বাক্সে সিন্দুকে সোনাদানা ভরে রেখে ডবল তালা ঝুলিয়ে রাখে।

মুকুন্দর বাক্সে সিন্দুকে ডবল তালাই ঝুলছিল। এখন অন্ধকার ঘরের কোণায় বাক্স সিন্দুক কিছুই দেখা যাচ্ছিল না যদিও, তবু মুকুন্দর চোখ দুটো একবার সেদিকে ভেসে যেতে দেখল রেবতী।

তাছাড়া আমার ঘরে সোনাদানা আসবে কোথা থেকে বলো? এদিকে মুখ ফিরিয়ে মুকুন্দ সুন্দর করে হাসল।

তাই তো, ঘরে মেয়েছেলে কেউ আছে যে সোনার গয়না সিন্দুকে পুরে রাখা হয়েছে, ফিরে এসে সে সেগুলো আবার পাড়বে? রেবতী দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

কিন্তু তুমি জান, আমার মায়ের সব গয়না বিমলা পেয়েছিল, তারপর একদিন ঝগড়াঝাটি করে সব খুলে ফেলল। সেসব আর কোনদিন পরেনি। পরে সে সব বিক্রী করে আমি ধানের জমি কিনেছি।

তাই বলো, তবে আর ঘরে সোনাদানা থাকেবে কেমন করে। একটা হাল্কা নিশ্বাস ফেলল রেবতী। আমার কিন্তু তেমন কিছু মনেই হয়নি, কেবল তোমার ওই বাক্স সিন্দুক দুটোর চেহারা দেখে—

হুঁ, যেন মুকুন্দও স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। অনেকদিন এভাবে তালাবন্ধ অবস্থায় পড়ে আছে, খোলা হয়নি, খোলার দরকারও পড়েনি। একটার ভেতরে পুরোনো আমলের ডেকচি কলসী থালা গেলাস হাতা খন্তা, আর একটা যেন পাথরের জিনিসে বোঝাই

হয়ে আছে—একদিন খুলে তোমাকে সব দেখাব বলাইদার কাছ থেকে চাবি চেয়ে এনে—আমি একটু অবসর হয়ে নি, লাঙলের কাজটা শেষ হোক—

তোমাকে ব্যস্ত হতে হবে না, তাড়াহুড়োর কিছু নেই—পাথরের জিনিস তামাকাঁসার বাসন কোসন কিছু পালিয়ে যাচ্ছে না।

মুকুন্দ খুশি হল। তারপর তাদের আলোচনার বিষয়ও বদলে গেল। কিন্তু খুব একটা কথা আর বলা হল না, ঘুম পেয়েছিল দুজনের। শুয়ে পড়ল। জেগে রইল শুধু অফুরন্ত জ্যোৎস্না, ফুলের গন্ধ, গাছের পাতার সরসর শব্দ। আর নেবুতলার একটি মানুষ। বলাই। সন্ধ্যা থেকে ঘুমিয়ে উঠে পটর পটর শব্দ করে সে হুঁকো টানছে বুঝি তখন।

না, আর গেল না রেবতী কামারাঙ্গা তলার সেই বুড়ির কাছে। দরকার নেই তার পোকামাকড়ের, বুড়ি আবার কী সব গল্প বানিয়ে বলবে, শুনে রেবতী মন খারাপ করবে। যেমন বিমলার গা ভরা গয়নার কথা শুনে হঠাৎ তার মন খারাপ হতে বসেছিল। তারপর মুকুন্দর মুখে সব শুনে অবশ্য মনটা হাল্কা হয়ে যায়। যদি বুড়ির কথা বিশ্বাস করা হত তো মানুষটার ওপর কী অবিচার না করা হত!

বলা যায় কি? হয়তো বুড়িকে ধমক টমক দিতে দুটো কড়া কথা শোনাতেই আর একবার রেবতী সেখানে ছুটে গেল, আর বুড়ি তক্ষনি সাজিয়ে এমন একটা গল্প বলল যে রেবতী তা বিশ্বাস করে বসল। আগের দিন বিশ্বাস করেনি, কিন্তু পরদিন যে দুষ্টু মেয়েছেলেটার বানানো গল্পই বিশ্বাস করে সে ঘরে ফিরে আসবে না তার ঠিক কি? মিথ্যা কথা একটু একটু করে শুনতে শুনতেই তো মিথ্যা কথা বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয়। যেমন আফিং-এর বিষ, একটু একটু করে খেতে খেতে পরে সেই বিষে একেবারে আচ্ছন্ন হয়ে যেতে প্রাণ ছটফট করে।

কাজেই রেবতী একদিনেই সাবধান হয়ে গেল। অন্তত মুকুন্দর সম্বন্ধে কোন বিষ সে তার কানে ঢালতে দেবে না, কাউকে না।

ঘরে সোনা থাকুক বা না থাকুক, দুপদ গয়নার জন্য মন খারাপ করার মতন অবুঝ মেয়ে রেবতী নয়।

সংসারটাকে দেখতে সে কম দেখেছে কি? অনেক ঘা খেয়েছে অনেক শিখেছে।

মুকুন্দ তাকে যা দিচ্ছে, যা দেবে তার তুলনা হয়?

মুকুন্দর ধানের জমি দেখলে তার চোখ জুড়িয়ে যায়, ক'দিন পর যখন সবুজ পাটের চারায় খেত ভরে উঠবে, তার বুক ভরে উঠবে। কত বড় বাগান কত বড় এক একটা দীঘি। কত বড় বাড়ি। সব তোমার। কাজেই—

ফুটফুটে শালিকটাকে নিয়ে সে মহানন্দে সারা সকাল কাটিয়ে দিল। শালিকের খাদ্য? মুকুন্দর সংসারে ভাত রুটি চালের খুদের অভাব আছে কিছু?

হুঁ, তবে কিনা জ্যান্ত জিনিস, পোকামাকড়। একটু রক্তমাংস পেটে না পড়লে বাচ্চা শালিক সাবালক হবে না, ঘাড়েগর্দানে শক্ত হবে না। তাই রেবতী হাঁটতে হাঁটতে একবারে রাখালের কাছে গিয়েছিল। এমনি আর যায় কি করে, তার ছুটো সেফটিপিন দরকার। যেন তাই কিনতে মোড়ের দোকানে গিয়েছিল রেবতী। হুঁ, মুকুন্দর দোকানে ছোট বড় নানা সাইজের সেফটিপিনও রাখে। তখন এক ফাঁকে রাখালের কাছে পোকামাকড়ের কথাটা তুলেছিল। রাখাল তৎক্ষণাৎ ঘাড় কাত করেছিল। খুব পারবে সে পোকামাকড় ধরে দিতে। তার নিজের শালিককে পোকামাকড় ধরে খাওয়ায় না? সুতরাং বৌদিমনিকে এর জন্য ভাবতে হবে না। রেবতী নিশ্চিন্ত হয়েছিল। কামরাঙ্গা তলার বুড়ির কাছে আর যেতে হবে না। ও, একটা শয়তান বটে।

আজ নিজের পয়সায় রেবতী সেফটিপিন কিনেছে, রাখাল এমনি দিতে চেয়েছিল। রেবতী কালো চোখ পাকিয়ে তাকে ধমক দিয়েছিল। ধমক খেয়ে রাখাল অবশ্য রাগ করেনি। লাল ঠোঁট ছুটো টিপে টিপে হাসছিল। আর তখন তার পাতলা ছোট গোঁফের রেখাটা কেমন একটু মোচড় খেয়ে নাকের ছিদ্রের সঙ্গে গিয়ে ঠেকেছিল, সেই ছবি রেবতী এখনও ভুলতে পারে না। এই জন্য ছেলেটার হাসিও এত সুন্দর লাগছিল। ধমক দিতে রেবতী নিশ্বাস বন্ধ করে সেই হাসি শুধু দেখছিল বললে ভুল হবে, যেন ছু'চোখ দিয়ে গিলছিল।

কে! ভাত খেয়ে রেবতীর চোখ ঢুলছিল, জানালায় মাথা রেখে বিছানায় একটু শুয়েছিল, চৌকাঠের কাছে পায়ের শব্দ হতে চমকে

উঠল। দরজার দিকে ঘাড় ফিরিয়ে সঙ্গে সঙ্গে ধড়মড় করে উঠে বসল। এসো এসো।

ঘেমে লাল হয়ে গেছে ছেলের মুখ, জুলপির কিনার ঘেঁষে ঘামের ভেজা দাগ চিকচিক করছে, কিন্তু দু চোখে হাসি ধরছে না। কচুপাতার ঠোঙা হাতে নিয়ে রাখাল চৌকাঠের ওপারে দাঁড়িয়ে ইতস্তত করছিল।

রেবতী হাতের ইসারা করে তাকে ভিতরে ডাকল। এলোমেলো চুল, বুকের বসন বিস্রস্ত, কিন্তু নিজের দিকে মনোযোগ দেবার সময় ছিল না রেবতীর, কেননা সে আশাই করতে পারেনি, এমন সময়, এমন একটা অসময়ে রোদে তেতেপুড়ে ঘেমেটেমে তার শালিকের খাবার নিয়ে রখাল এসে হাজির হবে।

ও কি, ভাত খেতে বাড়ি যাওয়া হয়নি? তার শুকনো ঠোঁট মুখ দেখে রেবতীর বুকের ভিতর ঢিপ করে উঠল।

রাখাল কথা বলল না। ঠোঁট টিপে হাসল। কচুপাতার ঠোঙাটা রেবতীর হাতে তুলে দিল।

কিন্তু রেবতী সেটা বিছানার পাশে নামিয়ে রাখল। রাখালের মুখের দিক থেকে মুখ সরাতে পারছিল না সে। ইস্ কেমন খারাপ লাগছে চেহারাটা! এতটা বেলা হল, রোদে ঘুরে ঘুরে ওই কর্মটি করা হল বুঝি। কী দরকার ছিল আমার পোকামাকড়ের!

রাখল জামার হাতায় কপাল মুছল। ওতে আমার কিছু হয় না! অমন দু এক বেলা ভাত না খেয়ে আমার অভ্যেস আছে। একটা বীরত্বের ভাব, অগ্রাহ্যের ভঙ্গী নিয়ে রাখাল মাথা নাড়ল, চোখ নাচাল।

বোসো এখানে। রেবতী আঙুল দিয়ে খাটের ধার দেখিয়ে তার পাশে রাখালকে বসতে বলল। অনেকটা আদেশের সুর ছিল তার গলায়।

খিদে পায় নি?

রেবতীর পাশে খাটের কিনারায় পা ঝুলিয়ে বসে রাখাল এক গাল হাসল। দোকানে মুড়ি ছিল, বাতাসা দিয়ে মুড়ি খেয়ে জল খেয়েছি। খিদে পাবে কেন?

বাহাদুর ছেলে বটে তুমি! দাঁড়াও। রেবতী তখনি উঠে পড়ল। যেন দুপদাপ করে বেরিয়ে গিয়ে ওপাশের রান্নাঘরে ঢুকল। এক মিনিটের মধ্যে থালায় করে ভাত তরকারী সাজিয়ে নিয়ে ফিরে এল। একটা টিপয় টেনে ভাতের থালাটা বসিয়ে দিয়ে রাখালের সামনে সেটা ঠেলে দিল। কুঁজো থেকে কাচের গেলাসে জল গড়িয়ে ভাতের থালার পাশে রাখল।

প্রথমটায় বেশ অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছিল রাখাল। তার ভীষণ লজ্জা করছিল এভাবে বাবুর ঘরে ঢুকে তাঁর বিছানায় বসে ভাত খেতে। তাও-কিনা বৌদিমণি নিজের হাতে ভাত বেড়ে নিয়ে এসেছে!

কিন্তু ভাতে হাত না ঠেকিয়েও উপায় ছিল না। যেমন কড়া চোখ করে রেবতী পাশে বসে বারবার হুকুম করছিল। নিঃশব্দে থালার সব কটি ভাত খেয়ে শেষ করল রাখাল। তারপর হাত মুখ ধুয়ে রেবতীর তোয়ালে দিয়ে হাত মুখ মুছল। রেবতীর ভিতরটাও ঠাণ্ডা হল। তখন বুঝি বেলা দুটো আড়াইটে।

পশ্চিমের জানলা দিয়ে রোদ ঢুকে ঘরের ভিতরের এই অংশটা ফরসা করে দিয়েছিল। হুঁ, যে পাশে সিন্দুক আছে, আলমারীর পিছনে কালো বাক্সটা রয়েছে। কিন্তু তখনও সেদিকে চোখ পড়েনি রেবতীর। মেঝের ওপর উপুড় হয়ে বসে শালিকের খাওয়া দেখছিল সে। সিমেন্টের ওপর পা ছড়িয়ে বসে দুই উরুর ফাঁকে শালিকটাকে বসিয়ে রাখাল ঠোঁট ফাঁক করে করে শালিকের মুখের ভিতর পোকা মাকড় গুঁজে দিচ্ছিল। রেবতী হি হি করে হাসছিল। যেন তখন রাখালই সেয়ানা শক্ত সমর্থ পুরুষ। আর রেবতী একটি ছোট খুকি। কেমন নিপুণ হাতে পাখির মুখে খাদ্য পুরে দেওয়া হচ্ছে।

হুঁ, এর পাখা লেজ বাদ দিতে হবে, আরশোলার পেট টিপে শুধু ভেতরের শাদা অংশটা রাখতে হবে—একটা কাটি দিয়ে ঘষে শুঁয়োপোকার আঁশগুলো আগে মজিয়ে নিয়ে তারপর—অনেক কিছু উপদেশ দিচ্ছিল রাখাল। রেবতী হুঁ হ্যাঁ করে মাথা নাড়ছিল। রাখালের কপালে ঘাম জমে উঠতে রেবতী শাড়ির আঁচল দিয়ে দুবার তার কপালের ঘাম মুছিয়ে দিয়েছে।

শালিকের খাওয়া শেষ হবার পর দুজনে গল্প করেছে। রাখাল বলেছে রেবতী শুনেছে। সবই পাখির গল্প। কোন্ পাখি কেমন করে শিষ দেয় কেমন তার ডাক, কী খেতে সে ভালবাসে। আর পাখি কেমন করে ধরতে হয়। তারপর পোষ মানান। পাখি ধরতে রাখালের জুড়ি নেই। অনেক পাখি সে এই জীবনে ধরেছে পোষ মানিয়েছে। আবার কিছু কিছু পাখি ধরে সে ছেড়েও দিয়েছে।

গল্পে গল্পে বেলা পড়ে এল। পশ্চিমের জানলার রোদ লাল হয়ে লম্বা হয়ে রেবতীর আলতা পরা টুকটুকে গোড়ালীর কাছে এসে থিরথির করে কাঁপছিল।

এবার রাখালকে উঠতে হয়। দোকানের ঝাঁপ খুলতে হবে। এখন খদ্দের আসবার সময়। আবার সে কাল আসবে। পোকা ধরে নিয়ে আসবে।

উঁহু, রেবতী ধমক লাগিয়েছে। নাওয়া-খাওয়া বন্ধ করে তার শালিকের জন্য রোদে পুড়ে রাখালকে পোকা মাকড় ধরে আনতে হবে না। আনতে হয় সকালে বাড়ি থেকে যখন বেরোবে, রাস্তায় যা পাবে দু'চারটে ধরে দোকানে যাবার পথে এখানে রেখে যাবে।

তা হলে যে একটা কৌটো দিতে হয় বৌদিমণি, পাউডারের খালি কৌটো হলে ভাল হয়। কৌটোর ভেতর পোকাগুলোকে ধরে আনতে সুবিধে।

তাই তো, এতটা রাস্তা, পাতায় মুড়ে আনলে পাতা-টাতা ছিঁড়ে যেতে পারে। রেবতী তৎক্ষণাৎ খালি কৌটো খুঁজতে

উঠে পড়েছিল। পাউডারের খালি কৌটা কি আছে! সবই তো নতুন ডিবি, পাউডারে ঠাসা, তোমার বাবু তো আর একটা পাউডার আনেনি আমার জন্য, তিনি চার রকম পাউডার কলকাতা থেকে কিনে এনেছে। কাজেই এক এক দিন এক একটা থেকে দিচ্ছি, কোনো ডিবিই আর খালি হচ্ছে না। বিড়বিড় করছিল রেবতী আর খালি-কৌটো খুঁজছিল। এদিক ওদিক খুঁজতে খুঁজতে শেষে পশ্চিমের জানলার কাছে আলনার সামনে গিয়ে যখন দাঁড়াল তখন কেমন থমকে গেল সে। আলনার পিছনটা ভয়ানক ফাঁকা ফাঁকা লাগছিল। কি ছিল ওখানটায়, কি যেন নেই? এক সেকেণ্ড ভুরু দুটো কুঁচকে রাখল সে। তারপর সব মনে পড়ল। মনে পড়তে একটা লম্বা নিঃশ্বাস বুক ঠেলে বেরিয়ে এল। যেন বুকের ভিতরটা খালি হয়ে গেল রেবতীর। যেন হাত পায়ে আর জোর রইল না, টলতে টলতে সেখান থেকে সরে এল।

কি হল, পাওয়া গেল না বুঝি!

দেখব, কাল আবার খুঁজে দেখব—আজ পাওয়া গেল না যখন, থাক। কথা বলতে কষ্ট হচ্ছিল, যেন গলার কাছে কিছু আটকে রয়েছে টের পেল রেবতী।

ঠিক আছে, কালও কচুপাতা কি ডুমুর পাতায় জড়িয়ে নিয়ে আসব। আর দেখি যদি দোকানে এক আধটা বার্লির কৌটো পাওয়া যায়—আমার যেন এখন মনে পড়ছে একটা কৌটো খালি হয়েছে।

রেবতী কথা বলল না।

চলি এখন, দোকান খুলতে হবে। মিষ্টি হেসে রাখাল ঘুরে দাঁড়াচ্ছিল।

শোনো। রেবতী বাধা দিল। রাখালের একটা হাত মুঠোর মধ্যে চেপে ধরল। কিন্তু আর কিছু বলতে পারল না সে, ঠোঁট দুটো শুধু কাঁপছিল।

রাখালও কথা বলতে পারছিল না। বুঝতে পারল কোনো ব্যাপারে

তার মনিব পত্নী মনে দুঃখ পেয়েছে। কাজেই তখনি ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে সে ইতস্তত করছিল।

রাখাল! রেবতীর গলার স্বর কাঁপছিল।

বলুন। রাখাল মাটির দিকে চোখ নামাল। রেবতীর চোখে জল ছলছল করছিল।

আমার কেউ নেই, আগেও ছিল না, এখনো নেই, একমাত্র তুই আমাকে ভালবাসিস। মনে হয় তুই ছাড়া আমার আজ আর কেউ নেই।

রাখালের বুকের ভিতর কাঁপছিল। এমন একটা কিছু সে আশঙ্কা করছিল। তার মাথাটা বুকের কাছে টেনে নিল রেবতী। সে শব্দ করল না। তার হাতের তেলো দুটো ঘামছিল। রেবতী তার ঠোঁটে বারবার চুমো খেতে লাগল। অন্য সময় হলে সে ফিকফিক করে হাসত। কিন্তু রেবতীর চোখে জল দেখে সে হাসতে সাহস পেল না। চুপ করে রেবতীর শরীরের সঙ্গে লেগে রইল।

এটা কি ভালবাসা? মোহ? উন্মাদনা? বুঝতে পারছিল না সে। তখনও তার শরীরের রক্ত ঝনঝন করছিল। এ ধরনের উন্মাদনা জীবনে কোনদিন অনুভব করেছে মনে করতে পারে না রেবতী। সতেরো বছর বয়সে তার বিয়ে হয়। যেদিন প্রথম একটি পুরুষ তাকে আলিঙ্গন করে সেদিনও তার রক্ত এমন টগবগ করে ফোটে নি। তারপর—তারপর নিয়তি তাকে পথে নামাল। কত পুরুষ তার জীবনে এল। এল, চলে গেল। সেখানে টাকা-পয়সার সম্পর্ক ছাড়া অন্য কোন সম্পর্ক কারো সঙ্গে গড়তে পারে রেবতী স্বপ্নেও ভাবত না। দোকান সাজিয়ে বাজারে বসত সে। অথবা মাথায় পসরা নিয়ে রাস্তায় ঘুরত। বেচা কেনা শেষ করে ঘরে ফিরে যেত। ভালবাসার কথা কেউ যদি সেদিন বলেছে রেবতী হাসত। মোহ—ভালবাসা। জীবনে একদিন একবার বুঝি তার স্বাদ পেয়েছিল সে। কিন্তু সে জিনিস অত্যন্ত ফিকে, অত্যন্ত পানসে ছিল। তাই মন থেকে সেই স্মৃতি মুছে যেতেও দেরি হয়নি।

না, কোনদিন কোন পুরুষ দেখে তার হৃৎপিণ্ড থরথর করে কেঁপে ওঠেনি। রক্তে এমন ঝনঝন করে শব্দ হয়নি। মুকুন্দ, যে তাকে স্ত্রীর আসনে বসিয়েছে বলে বার বার মনে করিয়ে দিচ্ছে, বলতে কি, এমন করে তাকে অস্থির মাতাল করতে পারেনি। কেবলই সে ভেবেছে মুকুন্দর সংসারে সুখ দেবে স্থিতি দেবে নিশ্চিন্ততা দেবে। যেন একটা প্রকাণ্ড গাছ এই পুরুষ। তার ছায়ায় বসে অনেকদিন পর রেবতী বিশ্রাম করবে আরাম করবে। আর পথে পথে ঘোরা নয় ঘাম নয়!

রেবতী লজ্জিত হল, বিষণ্ন হল। আবার স্তম্ভিতও হল। অদ্ভুত এক জীবন তার। বেঁচে থাকলে তার হাবুল ঠিক এত বড় ছেলে হত। এমন সুন্দর একটি কিশোর।

আর এই কিশোর কিনা তার রক্তের মধ্যে ঝড়ের মাতন তুলল। হুঁ, রেবতী এখন বুঝল, রাখালের কাছে এই প্রথম শিখল, ভালবাসা কী উন্মাদনা কী, মোহ কাকে বলে, কেমন করে একটি পুরুষ একটি মেয়েকে আচ্ছন্ন করে ফেলে।

পুরুষ। রাখাল পুরুষ! একটু আগে কেঁদেছিল, এখন রেবতী হাসল। তার দুই চোখে দপদপ করে একটা আগুন জ্বলছিল। আক্রোশের আগুন। তা হবে। হতে দোষ কি। যদি আজ সকালেও, রেবতী যখন সেফটিপিন কিনতে রাখালের কাছে গিয়েছিল, এমন একটা ব্যাপার ঘটত তো সে অনুতপ্ত হত, অনুশোচনার জ্বালা তাকে দগ্ধ করত, কিন্তু এখন সে মুক্ত স্বাধীন সুখী। আর অনুতাপ নেই, জ্বালা নেই। কোন বন্ধন নেই। মুকুন্দ সম্পর্কে তার সব দায়িত্ব শেষ হয়ে গেছে।

রেবতী অনেকক্ষণ লাগিয়ে প্রচুর সাবান খরচ করেও প্রচুর জল ঢেলে গা ধুল। তারপর ঘটা করে চুল বাঁধল, পুরু করে চোখে কাজল বুলোল, এত পাউডার ঢালল গলায় বুকে পিঠে। মুখে ক্রিম ঘষল। এবং সবচেয়ে দামী শাড়ি ব্লাউজ বাক্স থেকে বার করে পরে নিল।

এখন মুকুন্দ ঘরে ফিরবে। এখনি চাঁদ উঠবে। জানলার ওপারে বকুল গাছের পিছনে আকাশে আগুন ধরে গেছে। চার পাঁচটা কোকিল এক সঙ্গে ডাকছিল।

মুকুন্দর জন্য অপেক্ষা করল না সে।

ঘর থেকে বেরিয়ে লম্বা পা ফেলে মোড়ের মুদি দোকানের দিকে এগোতে লাগল। দেরি করলে ঝাঁপ বন্ধ করে রাখাল চলে যাবে।

•

রাত করে ফেললে?

হাঁটতে হাঁটতে ওদিকটায় চলে গিয়েছিলাম।

কতদূর?

সেই যে ভাঙ্গা একটা শিবমন্দির। রেবতী অল্প শব্দ করে হাসল। মুকুন্দ অবাক হল।

তা হলে তো প্রায় কেষ্টপুরে চলে গিয়েছিলে। রাখালদের গাঁ।

দীর্ঘ পথ হেঁটে এসে রেবতী ক্লান্ত, খাটের কিনারায় বসল।

রাখালের সঙ্গেই গিয়েছিলাম। তার গ্রামটা দেখে এলাম। একটু থেমে রেবতী আবার বলল, আজ দুপুরে রাখাল আমার শালিকের জন্য পোকা ধরে নিয়ে এসেছিল। রাখালকে দুটো ভাত খাইয়ে দিলাম। সারা দুপুর ঘুরে ঘুরে বেচারা আমার জন্য পোকা ধরেছিল।

মুকুন্দ নীরব। ওদিকে তাকিয়ে থেকে কিছু ভাবছিল কি সে? রেবতীও জানলার বাইরে চোখ রাখল। পূর্ণিমা রাত। বসন্তের জ্যোৎস্না যেন চিৎকার করছিল।

রেবতী বলল, কাল বৃহস্পতিবার, কাল নাকি দোকান খুলবে না। রাখালের সঙ্গে আমি মেলায় যাব।

উঁহু, এতক্ষণ পর মুকুন্দ মুখ ফেরাল। কাল লাঙলীরা আসবে না, আমি শিকারে বেরোব। তুমিও আমার সঙ্গে যাবে।

সে কি! রেবতী হাসল। কিন্তু তার চেয়ে যেন চমকে উঠল অনেক বেশি। আমি যে রাখালকে কথা দিয়েছি। সকালে ঘুম থেকে উঠে চলে আসবে। রাখাল আমায় নিয়ে যেতে আসবে। সারাদিন আমরা কেষ্টপুরে শিবতলার মেলায় কাটাব। তারপর সন্ধ্যেবেলা—

রেবতীর কথা শেষ হল না।

মুকুন্দ খাট ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। পায়চারি করতে লাগল। ঘরে ফিরে সে কাপড়-চোপড় বদলায় নি। রেবতীকে হঠাৎ ঘরে দেখতে না পেয়ে তখনি সে আবার বেরিয়ে গিয়েছিল। ভিতর বাড়ির উঠোনটা দেখেছিল। রান্নাঘরের দরজায় উঁকি দিয়েছিল। কুয়োতলায় গিয়েছিল। কোথাও রেবতীকে দেখতে না পেয়ে শেষে

দীঘির ধারে ছুটে গিয়েছিল। হয়তো বকুলতলার চাতালে আজ রেবতী একলাই বসে আছে দেখতে পাবে। কিন্তু সেখানেও সে কাউকে দেখল না। তারপর সে আবার বাড়ি ফিরে এসেছে। আবার ভিতরের উঠোনে ঢুকেছে। উঠোন পার হয়ে লেবুতলার দিকে এগিয়ে গেছে। হাঁটতে হাঁটতে চলে গেছে সেই কামরাঙ্গা তলায়। তখন বেশ অন্ধকার হয়ে এসেছিল। ঝিঁঝিঁ ডাকছিল। জোনাকি উড়ছিল। কে জানে, রেবতী যদি তার শালিকের পোকা ধরতে কচুর ঝোপ কুলের জঙ্গলের কাছে এসে থাকে।

কাল রাত্রে শালিকের পোকা কোথায় পাওয়া যাবে এই নিয়ে যেন রেবতী তাকে দুবার প্রশ্ন করেছিল। মুকুন্দর ঘুম পেয়েছিল। হুঁ হ্যাঁ কিছু উত্তর দেবার আগেই সে ঘুমিয়ে পড়ে।

কিন্তু কোথায় রেবতী! অন্ধকারে মুকুন্দকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সেই গোবর টালের বুড়ি কুসুমের মা খলখল করে হাসছিল। অর্থাৎ বুড়ির আহ্লাদ ধরছিল না। কত যুগ পরে মুকুন্দ জঙ্গলের কাছে গেছে। এবং মুকুন্দরও তখন মনে পড়ল, বিমলাকে খুঁজতেআরএকদিন ঠিক এমন ভর সন্ধ্যায় তাকে এখানে ছুটে আসতে হয়েছিল। সেদিন কুসুমের মা দু হাত নেড়ে, হাত না শুকনো দুটো হাড়ের কাঠি শূন্যে নাচিয়ে এত এত কথা বলেছিল। আজ আবার হাড়ের কাঠি দুটো মুকুন্দর নাকের সামনে নাচিয়ে বুড়ি কথা বলল। কথা যত না বলল খলখল করে হাসল অনেক বেশি। সেদিন মুকুন্দ দপদপে একটা আগুন নিয়ে ঘরে ফিরে এসেছিল। গুলিভরা বন্দুকটা বিমলার বুকের সামনে উঁচিয়ে ধরেছিল। বিমলা ভয় পেয়ে চিৎকার করে উঠেছিল। মুকুন্দর পা ধরে কেঁদেছিল। প্রতিজ্ঞা করেছিল। নাকে খত দিয়েছিল। ক্ষমা চেয়েছিল। ক্ষমার শরীর মুকুন্দর। ক্ষমা করেছিল। হাত থেকে বন্দুকটা নামিয়ে রেখেছিল। আর সেই রাত্রে, ভোর হবার অনেক আগে, আকাশ ভরে যখন তারা জ্বলছিল বিছানা থেকে নেমে চুপি চুপি দরজার খিল খুলে বিমলা পালিয়ে গেল।

আজ মুকুন্দর মগজে আগুন না। বুকের ভিতরটা কেমন ফাঁকা ফাঁকা ঠেকছিল। লেবুতলা পার হয়ে যখন ফিরে আসে তখন তার মনে হচ্ছিল তার পায়ে জোর নেই। যেন কত পথ সে সারাদিন হেঁটেছে। গলার কাছটা শুকনো লাগছিল। বলাইদার ঘরের পাশ দিয়ে সে এল। বুড়ো তখন শুয়ে পড়ার উদ্যোগ করছিল। টের পেয়েও মুকুন্দ সেখানে দাঁড়াল না। অন্যদিন ওদিকে গেলে বুড়োর সঙ্গে দুটো কথা না বলে সে আসে না। কিন্তু তার মনে হচ্ছিল ভয়ানক ক্লান্ত হয়ে পড়েছে সে। যেন তখন শুয়ে পড়লে তার ভাল লাগবে।

শোয়া অবশ্য হল না। কেন না ঘরে ফিরে এসেও সে দেখল রেবতী আসেনি। এবং তখন সে বুঝতে পেরেছিল, যদি কোথাও রেবতী গিয়ে থাকে তো দোকানের ওই ছোঁড়ার সঙ্গেই গেছে। সন্ধ্যাবাতি লাগতে দোকান বন্ধ করে দেবার কথা। কাজেই রেবতী যে দোকানে নেই এবং তার কর্মচারীটিও সেখানে বসে নেই মুকুন্দ এ সম্পর্কে নিশ্চিন্ত ছিল। কোথায় দুটিতে যেতে পারে সেটাই কথা। একলা রেবতী কোথাও বেরোয়নি। রাস্তার মোড় পর্যন্ত গেছে, অশ্বত্থ তলায় দোকান পর্যন্ত যেতে পেরেছে। কিন্তু তার বেশি এদিক ওদিক রাস্তাঘাটও তার জানা নেই, তা ছাড়া অন্ধকার হয়ে গেছে। নতুন জায়গা একা দূরে যেতে সাহস পাবে না।

মুকুন্দ ইচ্ছা করে আর বেরোল না। যেন তখন তার মাথায় একটা জেদ চাপল। হাতের মুঠ শক্ত করে জানালার কাছে চুপ করে বসে রইল। কামরাঙ্গাতলা থেকে ফেরার সময় যেন সাংঘাতিক ক্লান্তি লাগছিল। ঘরে ফিরে এসে কিন্তু সেই জিনিসটা আর একেবারে ছিল না। বরং হাতের মুঠ শক্ত করে একটা কিছুর ওপর জোরে আঘাত করতে তার কেমন ইচ্ছা করছিল। তেমন কিছু অবশ্য করল না। পাঁচ বছর আগে হলে সে কি করত বলা মুস্কিল। অনেক কিছুই হয়তো করত। এভাবে চুপ করে জানলায় বসে

থাকত না। আজ সে বসন্তের জ্যোৎস্না দেখতে লাগল। তারপর কয়েকটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

এবং সবচেয়ে বড় কথা, সব বুঝতে পেরেও কারো ওপর যেন সে রাগ করতে পারছিল না।

যেন এমন হবে সে জানত, আগেই তার জানা ছিল।

কিন্তু সেই জানাটাকে—সেই উপলব্ধিকে সে গ্রাহ্য করেনি। জানার বাইরেও কি কিছু ঘটতে পারে না—হয়তো ঘটবে, হয়তো যেটুকু সে আশঙ্কা করছিল তা কেটে গিয়ে আলোর দেখা সে পাবে, এমন একটা জোরালো আশাও সে ক্রমাগত বুকের মধ্যে লালন করছিল। পাঁকে ছিল বলেই যে চিরকাল একটা ফুলের গায়ে পাঁকের গন্ধ লেগে থাকবে তার কি কথা আছে।

ভালবাসা দিয়ে প্রেম দিয়ে সুখ দিয়ে নিজের সর্বস্ব বিলিয়ে দিয়ে কি পাঁকের কলঙ্কটুকু মুছে দিতে পারবে না সে? একটা ফুলের বর্ণ গন্ধ ফিরিয়ে আনা কি একেবারে অসম্ভব। স্বাভাবিক বর্ণ গন্ধ নিয়েই তো রেবতী একদিন বেঁচে থাকতে চেয়েছিল। স্বামী ছিল সন্তান ছিল। দুর্ভাগ্য যদি তাকে কাদায় টেনে আনে তো তাকে যে চিরকালই ঘৃণা করতে হবে, সন্দেহ করতে হবে এমন অন্যায় যুক্তি মুকুন্দ মানতে রাজী ছিল না।

আজ এই একটা বেলার মধ্যে কি রেবতী তার সমস্ত বিশ্বাস, এত বড় একটা আশা ভেঙ্গে দিতে যাচ্ছে।

পায়চারি থামিয়ে মুকুন্দ খাটের সামনে দাঁড়াল। রেবতী খাট ছেড়ে আলনার কাছে সরে গিয়ে পিছন ফিরে জামা কাপড় বদলাতে লাগল।

কাল কিছুতেই শিবতলার মেলায় তোমার যাওয়া হবে না। মুকুন্দ আর দ্বিধা করল না। যেন বেশ কিছুক্ষণ চিন্তা করার পর দরাজ গম্ভীর গলায় কথাটা জানিয়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে রেবতী ঘুরে দাঁড়াল। শাড়ি খোলা হয়েছিল। শুধু সায়াটা পরনে। ব্লাউজের

বোতাম সবে খুলছিল। তার আঙুল থেমে গেল। আমি যাব—রাখাল আমায় নিয়ে যেতে আসবে। খুব সকালে আমরা এখান থেকে রওনা হব।

রাখালকে আমি বলে দেব—সে ফিরে যাবে। তুমি আমার সঙ্গে যাবে। রুদিজলার বিলে কাল শিকার করতে যাব।

শিকার দেখতে আমার ভাল লাগে না। রেবতী তৎক্ষণাৎ আবার ঘুরে দাঁড়াচ্ছিল।

মুকুন্দ বাধা দিল।

শোন!

বলো।

এক সেকেণ্ড চুপ করে রইল মুকুন্দ। বুকের দুটো বোতাম খুলে ফেলল রেবতী। মুকুন্দর চোখ সেদিকে ছিল না—স্থির গভীর দৃষ্টি নিয়ে আর একজোড়া চোখই সে শুধু দেখছিল।

আমি শিকারে যাচ্ছি, অথচ তুমি একটা ছেলের সঙ্গে, আমার দোকানের কর্মচারীর সঙ্গে আর এক জায়গায় বেড়াতে যাচ্ছ, এটা খারাপ দেখায়।

কেন, খারাপটা কেন? রেবতীর চোখ দুটো ছোট হয়ে গেল।

তুমি এপাড়ার বৌ, আমার সঙ্গেই তোমার বেড়াতে যাবার কথা, সেটাই দৃষ্টি শোভন হবে—এক সেকেণ্ড থেমে থেকে মুকুন্দ বলল, বিমলাকেও অন্য কারো সঙ্গে কোথাও যেতে দেইনি—যদি কোথাও গেছে আমার সঙ্গেই গেছে।

রেবতী হাসল।

বিমলাকে তুমি চোখে চোখে রাখতে, সন্দেহ করতে তাকে, তাই যখন যেখানে গেছ সঙ্গে নিয়ে গেছ।

আশ্চর্য। তর্ক আরম্ভ করলে তুমি। মুকুন্দর কপালের রগ ফুলে উঠল। হুঁ, তাকে সন্দেহ করেছি, তোমাকে করি না, তা হলেও

তুমি এ বাড়ির বৌ, বৌয়ের মর্যাদা তুমি রাখবে এটা কি আমি আশা করতে পারি না?

রেবতী কথা বলল না। ঘুরে দাঁড়িয়ে আটপৌরে শাড়ি পরল। সিল্কের ব্লাউজ খুলে ফেলে সুতীর ব্লাউজ পরল।

কি হল, চুপ করে রইলে? মুকুন্দ একটা চাপা নিশ্বাস ফেলল।

রেবতী চুলের ফিতা খুলছিল। যেন হঠাৎ নতুন কিছু শুনছে। চমকে উঠে ঘাড়টা একটু ফেরাল, এবং সেভাবে দৃষ্টি আড় করে মুকুন্দকে দেখল।

আমি কি এ বাড়ির বৌ? আমি তো বৌ না।

তুমি কি? যেন মুকুন্দর মুখের ভেতরটা তেতো হয়ে উঠল। একটু চুপ থেকে মুখটা অন্যদিকে ফিরিয়ে নিল। তারপর গম্ভীর থমথমে গলায় বলল, অন্তত আমি তো তাই মনে করতাম, সেই সম্মানই তোমাকে দিয়েছিলাম।

না, সেই সম্মান তুমি দাওনি।

কি রকম? হঠাৎ একথা বলছ আজ! মুকুন্দ বড় করে একটা ঢোক গিলল।

রেবতী তখন আরসির কাছে চলে গেছে। ঘুরে দাঁড়িয়ে চুল খুলছে। মুখ না ফিরিয়ে রুক্ষ কঠিন গলায় বলল, আমি যা ছিলাম, আমি যা আছি সেই চোখ নিয়ে সেই মন নিয়ে তুমি আমায় দেখছ, সে রকম ব্যবহার করছ, আমাকে এক চুল বেশি সম্মান দিচ্ছ না।

কি রকম?

আমি রাস্তার বেশ্যা ছিলাম, এখন তোমার হয়ে আছি। রক্ষিতার সঙ্গে মানুষ যে ব্যবহার করে তুমিও তাই করছ।

যেন অনেক দুঃখে মুকুন্দ হাসল। মাথা নাড়ল। এটা তোমার ধারণা, তুমি ভুলতে পারছ না তুমি একদিন কী ছিলে—কিন্তু আমি ভুলে গেছি—আমি তোমায় সব দিয়েছিলাম, সব দিতে চাইছি—

কিছুই দাওনি। রেবতী সম্পূর্ণ ঘুরে দাঁড়াল। হ্যাঁ, দিয়েছ, মুখে মুখে তোমার রাজত্ব পায়ে ঢেলে দিয়েছ।

মুকুন্দ স্তম্ভিত হয়ে গেল। রেবতীর চোখে জল এসে গেছে।

শোন রেবতী, মুকুন্দ একটু ঝুঁকে তার হাত ধরতে গেল কিন্তু রেবতী তৎক্ষণাৎ সেই হাত সরিয়ে নিয়ে চোখে আঁচল চাপা দিল।

তুমি যে এমন ধারণা নিয়ে বসে আছ আমি ভাবতে পারিনি—আমার মনে হয়, তোমার কথা শুনে আমি যা বুঝলাম—তুমি আমার ওপর অবিচার করছ। মুকুন্দর গলার স্বরে যন্ত্রণা ফুটে উঠল। যেন অত্যন্ত হতাশ হয়ে সে আবার পায়চারি করতে লাগল।

রেবতী চোখ থেকে আঁচল নামাল। যেন মুকুন্দর সঙ্গে না, কড়িকাঠের সঙ্গে কথা বলল, সেদিকে তার চোখ ছিল।

জানি না কালো ট্রাঙ্কটার ভেতর কী পরিমাণ সোনাদানা ছিল, কিন্তু যেহেতু আমি ওটা খুলে দেখতে বলেছি, ওটার কথা ভেবেছি, সবচেয়ে বড় কথা, আমার চোখের ওপর বাক্সটা রয়েছে, সারাক্ষণ আমি এই নিয়ে ভাবব—কিছু বলা যায় না তো, কাজেই এটা এঘর থেকে আজই সরিয়ে ফেল, তাও কখন, লুকিয়ে—সকাল-বেলা যখন আমি দুটো সেফ্‌টিপিন কিনতে রাখালের দোকানে চলে গেলাম—

হঠাৎ মুকুন্দর মুখে কথা সরল না। রেবতী লক্ষ্য করল, এত বড় একটা পুরুষ মুহূর্তের মধ্যে কেমন যেন দুর্বল ফ্যাকাশে হয়ে গেল। ফ্যালফ্যাল করে জানলার পিছনের ফাঁকা জায়গায়াটার দিকে চেয়ে আছে সে।

ডবল তালা ঝুলছিল বাক্সে। কিন্তু তবু আমাকে নিয়ে ভয় আমাকে নিয়ে অবিশ্বাস।

রেবতী পুবের জানালায় সরে গেল। জানালার দিকে মুখ করে আস্তে আস্তে বলল, কাজেই আমি যেমন ছিলাম তেমনি থাকব, আছিও তাই, কী দরকার একটা মিছে সম্মানের মুখোস ঝুলিয়ে—রাখালের সঙ্গে মেলা দেখতে যেতে আমার একটুও লজ্জা করবে না।

শোন। আমার দিকে তাকাও।

রেবতী তাকাল না। মুকুন্দ জানালার কাছে সরে গেল। বাক্সের ভেতর আমার মায়ের কতগুলো পাথরের থালা বাটি গেলাস সন্দেশের ছাঁচ ছাড়া অন্য কিছু ছিল না তোমায় বলেছি।

হ্যাঁ, বলেছ। বিদ্যুৎ চমকের মতন রেবতী ঘুরে দাঁড়াল। কিন্তু সেটা এ ঘর থেকে হঠাৎ সরিয়ে ফেলা হল কেন? তাও চুপি চুপি —যখন আমি ঘরে ছিলাম না।

যেন উত্তরটা মুকুন্দর তৈরি ছিল। সঙ্গে সঙ্গে বলল, আমি সরিয়ে নিতে বলেছি। এত বড় একটা বাক্স জায়গাটা জুড়ে আছে—সকালে বাড়ি থেকে বেরোবার সময় চাকরদের বলে গিয়েছিলাম ওটা সরিয়ে ফেলে ওখানটায় ঝাঁটটাট দিয়ে ধুলো ময়লা পরিষ্কার করতে। আলনার পেছনটা কেমন নোংরা হয়ে ছিল—আমার কথা মতন তারা জিনিসটা সরিয়ে নিয়েছে—

কোথায় গেছে এখন সেই ট্রাঙ্ক? তোমার ভাঁড়ার ঘরে—না কি ঢেঁকি ঘরে? রেবতীর গলায় শ্লেষ ফুটে উঠল।

এক সেকেণ্ড তার চোখ দুটো দেখল মুকুন্দ। তারপর অন্যদিকে তাকাল। আমি ঠিক জানি না—সম্ভবত বলাইদা নিজের ঘরে নিয়ে রেখেছে।

রেবতী কথা বলল না, তার গলার ভিতর ক্ষীণ একটা শব্দ হল শুধু। সেই শব্দের মধ্যে চাপা একটু হাসি শুনতে পেল মুকুন্দ।

বেশ তো, তুমি যদি দেখতে চাও আমি বলাইদাকে বলে ওটা তোমায় খুলে দেখাব।

আমার দেখে দরকার নেই—যা বুঝবার আমি বুঝে গেছি।

যেন আর ধৈর্য রাখতে পারল না মুকুন্দ, যেন এ পর্যন্ত অনেক সহ্য করেছে সে। যা বুঝবার বুঝে গেছি বলে রেবতী মুখ ঘুরিয়ে কেমন মিটিমিটি হাসছিল।

তা হলে তুমি আমার কথা বিশ্বাস করছ না! মুকুন্দ প্রায় চিৎকার করে ওঠার মতন শব্দ করল।

রেবতী চেঁচাল না। স্থির গাঢ় গলায় বলল, আমার বিশ্বাস অবিশ্বাসে কী এসে যায়। তোমার বিশ্বাসটাই এখানে সব—একটা রাস্তার বেশ্যাকে কোনোদিন কেউ বিশ্বাস করেনি—আজ হঠাৎ তুমি বিশ্বাস করবে, সতী সাধ্বী গিন্নী মনে করে তাকে সর্বস্ব তুমি বিলিয়ে দেবে—এ হয় না, কোনোদিন হয়নি, কাজেই—

রেবতীর চোখ এবার আর ছলছল করল না, যেন চোখ দুটো জ্বলতে লাগল।

তা হলে কাল রাখালের সঙ্গে তুমি যাবেই। মুকুন্দ কোমরে হাত রেখে হঠাৎ কেমন যেন শক্ত সোজা হয়ে দাঁড়াল।

হ্যাঁ। রেবতী শুকনো গলায় উত্তর করল। আমি যখন এ সংসারে একটা রক্ষিতা ছাড়া আর কেউ না, তখন আমার কারো সঙ্গে কোথাও বেরোতে বাধা কোথায়।

তার মানে নিতান্তই একটা অজুহাত—একটা বাজে কারণ দেখিয়ে তুমি আমার অবাধ্য হতে চলেছ। মুকুন্দর গলার স্বর গমগম করে উঠল।

রেবতী শব্দ করল না। মুকুন্দ চুপ থাকল না। বরং সে ক্রমেই বেশি অস্থির হয়ে উঠছিল।

দাঁড়াও, এখনি তালা খুলে সেই বাক্সে কী আছে তোমাকে দেখিয়ে দিচ্ছি—আলোটা দেখি। হ্যারিকেনটা তার পায়ের কাছে ছিল। সেটা তুলে নিয়ে দুপদাপ করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

রেবতী এবার ঘরের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে ভিতরটা দেখল। যেন অনেকক্ষণ সে এদিকে ভাল করে তাকায় নি। হাত বাড়িয়ে ব্রেকেট থেকে তোয়ালেটা টেনে নিল, কপালটা মুছল, কুঁজো থেকে গেলাসে জল গড়িয়ে নিয়ে সবটা জল এক চুমুকে খেয়ে শেষ করল।

এক মিনিট পর মুকুন্দ হাতে হ্যারিকেন ঝুলিয়ে ফিরে এল।

কিন্তু পায়ের দুপদাপ শব্দ ছিল না। স্তিমিত মন্থর গতি। ভিতরে ঢুকে আলোটা নিচে নামিয়ে রাখল।

রেবতী তার দিকে তাকাল না। শব্দ করল না। পা মুছে বিছানায় উঠে গেল। এক সেকেণ্ড সেদিকে চোখ রেখে মুকুন্দ বলল, কাল, বুড়ো যেন ঘুমিয়ে পড়েছে—এখন ডাকতে গেলে ভয়ানক বিরক্ত হবে—কাল সকালে তোমাকে দেখাব ট্রাঙ্কটার ভেতর কত সোনাদানা আমি লুকিয়ে রেখেছি।

জানালার দিকে মুখ ঘুরিয়ে কপালের ওপর বাঁ হাতটা ফেলে রেখে যেন হাতের একটা আড়াল রেখে রেবতী শুয়ে থাকল। এদিকে ফিরল না। টিনের চালে একটা লিচুর ডাল বুঝি ঠেক খেয়েছিল। জোরে হাওয়া উঠছিল। টিনের ঠকঠক শব্দ হচ্ছিল। বাইরে জ্যোৎস্নাটাও হঠাৎ মরে গেল। বোঝা গেল পূর্ণিমার চাঁদ মেঘে ঢাকা পড়ল। অসময়ে ফাল্গুনের আকাশে মেঘ ঘনিয়ে এল। তাতে লাঙলের সুবিধে হবে কি হবে না, অন্যদিন হলে মুকুন্দ তাই ভাবত, দরজায় দাঁড়িয়ে আকাশের অবস্থা দেখত, কিন্তু আজ সে কিছুই করল না। চুপ করে জানালার কাছে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে একভাবে বসে রইল। এক সময় কপালের রগ দু'টো আঙুল দিয়ে চেপে ধরল। চালের ওপর দু'চার ফোঁটা বৃষ্টির শব্দ শোনা গেল। কোথাও কোকিল ডাকছিল না। যেন দূরে, অনেক দূরে একটা ডাহুক হঠাৎ ঘুম থেকে জেগে উঠে দুবার ডেকে আবার চুপ করে গেল।

জেগে বসে থেকে মুকুন্দ বুঝি প্রভাতের অপেক্ষা করছিল।

রেবতীর ঘুম ভাঙল বেশ বেলা করে। অবাক হল সে। এত রৌদ্রে চারদিক ভরে গেছে, যেন বিশ্বাস করতে পারছিল না সে। চোখ খুলে দেখল দরজা খোলা। মুকুন্দ নেই। অন্যদিন অবশ্য ভাল করে ভোর হবার আগেই মুকুন্দ বেরিয়ে যায়, যাবার আগে রোজ দরজা ভেজিয়ে রেখে গেছে। আজ দরজাটা এমন হাঁ হয়ে আছে বলেই উঠোনের রোদের একটা ঝলক হঠাৎ তার চোখ দুটোকে ধাঁধিয়ে দিল। তৎক্ষণাৎ ঘাড় ঘুরিয়ে টেবিলে মুকুন্দর টাইমপিসটা দেখল সে। সাড়ে সাতটা বাজে। বেজে গেছে।

একটু হতাশ হল রেবতী। কাঁটায় কাঁটায় ছটায় রাখালের আসার কথা। সে কি এসেছিল? ফিরে গেছে? না কি বাইরে কোথাও অপেক্ষা করছে? এক সঙ্গে হ্যাঁ না মিলিয়ে গুচ্ছের চিন্তা মাথায় নিয়ে সে তাড়াতাড়ি খাট থেকে নামল। দু হাতে চুল ঠিক করল, কাপড়টা সামলে নিল। মুখ হাত ধুয়ে জামা কাপড় পরতে কতটা সময় লাগবে মনে মনে একটা হিসাবও করে ফেলল সে। তারপর তোয়ালে কাঁধে ফেলে সাবানের বাক্স টুথ ব্রাস ইত্যাদি হাতে তুলে নিয়ে চৌকাঠের বাইরে এল। এদিকের বারান্দায় না ওদিকের বারান্দায় মুকুন্দকে দেখে একবার থমকে দাঁড়াল রেবতী। কিন্তু মুকুন্দ চোখ তুলল না। মাথা গুঁজে বন্দুক পরিষ্কার করতে ব্যস্ত সে। রেবতী এক সেকেণ্ড মানুষটাকে দেখল। তারপর এক চিলতে হাসি ঠোঁটের কোণায় ঝুলিয়ে কুয়োতলার স্নানের ঘরের দিকে চলে গেল।

ফিরে এসে রেবতী দেখল মুকুন্দর পরনে সার্ট প্যাণ্ট পায়ে ভারি জুতো।

এমন পোষাকে তাকে সে কোনোদিন দেখেনি। তাই বেশ একটু

অবাক হল। বারান্দার একটা চেয়ারে বসে আছে মুকুন্দ। বন্দুকটা চেয়ারের হাতলের সঙ্গে দাঁড় করানো। মুকুন্দর পায়ের কাছে মাটিতে একটা টিফিন ক্যারিয়ার। একসঙ্গে রেবতী সব লক্ষ্য করল।

কথা না বলে সে ঘরে ঢুকছিল। মুকুন্দ তার দিকে চোখ তুলল, তুমি তাড়াতাড়ি কাপড় পরে নাও, আমরা এখুনি বেরিয়ে পড়ব।

রেবতী দাঁড়াল। ভুরুতে চোখের পাতায় জল চিকচিক করছে। অতিরিক্ত ঘুমিয়ে উঠেছে বলে মুখটা বেশি ভরা ভরা লাগছে। ঠোঁট দুটো তাজা পরিচ্ছিন্ন, কোনো ফুলের পাপড়ির মতন দেখাচ্ছে। হঠাৎ যেন মুকুন্দর চোখের পলক পড়ল না।

তার সঙ্গে চোখাচোখি হবার আগে রেবতী অন্যদিকে মুখ ফেরাল। তারপর মাথা নাড়ল।

আমি তোমার সঙ্গে যাব না, কাল অনেকবার বলেছি।

কার সঙ্গে যাচ্ছ? মুকুন্দ ঘাড় সোজা করে ধরল।

রাখাল আসবে। হয়তো এসেছে, বাইরে কোথাও অপেক্ষা করছে।

হুঁ, এসেছিল, মুকুন্দ তৎক্ষণাৎ উত্তর করল, তুমি তখনো জাগোনি—

তারপর? কোথায় আছে সে? চলে গেছে? রেবতী চঞ্চল হয়ে উঠল।

চলে গেছে। আমি তাকে নিষেধ করেছি। তুমি তার সঙ্গে যাবে না।

কেন নিষেধ করলে? তা ছাড়া আমি তো তোমার নিষেধ শুনছি না—মাথায় ছোট একটা ঝাঁকুনি দিয়ে রেবতী তৎক্ষণাৎ ঘরে ঢুকে পড়ল।

চুপচাপ কাটল ক'টা মিনিট। মুকুন্দ কান খাড়া করে রাখল। ভিতরে সুটকেস-এর ডালা খোলার শব্দ হল। রেবতী কাপড় পরছে, মুকুন্দ অনুমান করল। এবার সে আশা করছিল, হয়তো শেষ পর্যন্ত মতের পরিবর্তন হয়েছে রেবতীর। তার সঙ্গেই সে যাচ্ছে। কিন্তু

একটু দেরি হয়ে গেল নাকি। ভুরু কুঁচকে হাতের ঘড়ি দেখল মুকুন্দ।

রেবতী ভিতর থেকে বেরিয়ে এল। মুকুন্দর দিকে তাকাল না, দাঁড়াল না পর্যন্ত, সিঁড়ির দিকে এগোতে লাগল।

চেয়ার ছেড়ে মুকুন্দ উঠে দাঁড়াল।

কোথায় যাচ্ছ তুমি?

দোকানে। রেবতী ঘাড় ফেরাল না।

রাখাল দোকানে নেই, আজ বৃহস্পতিবার দোকান খোলা হবে না। মুকুন্দও সিঁড়ির দিকে পা বাড়াল।

তা হলেও সে দোকানে থাকবে—আমার জন্য অপেক্ষা করবে।

না, তোমার জন্য অপেক্ষা করবে না। মুকুন্দ চিৎকার করে উঠল। সে অনেকক্ষণ হয় চলে গেছে—আমি তাকে চলে যেতে বলেছি।

রেবতী তবু হাঁটছিল। বাগানের কাছে সে চলে গিয়েছিল। মুকুন্দও সেদিকে এগোল।

আমি কেষ্টপুরের রাস্তা চিনি। হয়তো রাস্তায়ও দেখা হয়ে যেতে পারে। হবেই। যেন চলতে চলতে নিজের মনে কথা বলছিল রেবতী। কোনো গাছতলায় রাখাল আমার জন্য বসে অপেক্ষা করবে।

উঃ, এত লালসা তোমার, একটা বাচ্চা ছেলের মাথা খাবার জন্যে এমন উত্তাল হয়ে উঠলে! পিছন থেকে মুকুন্দ তার হাত চেপে ধরল। তার বাঁ হাতে বন্দুক, ডান হাতে রেবতীর কনুইর কাছটা শক্ত করে ধরল।

তুমি কি জোর করে আমাকে আটকাবে? রেবতী ঘুড়ে দাঁড়াল।

মুকুন্দ কথা বলল না। হাত ছেড়ে দিল।

আমি বেশ্যা, বেশ্যার যা ধর্ম সে তাই করবে, কচি জোয়ান সকলের জন্যই তার জিভ দিয়ে নাল ঝরে।

মুকুন্দ স্তব্ধ হয়ে গেল। মাটির দিকে চোখ নামাল।

আমি যাচ্ছি, আমাকে যেতেই হবে—রেবতী ঘুরে দাঁড়িয়ে আবার হাঁটছিল। মুকুন্দ আর চুপ থাকল না।

এখানে নয়, এখানে নয়—রসুলপুরের আশে-পাশে কোনো গাঁয়েই এ ধরনের নষ্টামি আমি তোমাকে করতে দিতে পারি না, এটা তুমি নিশ্চয় বুঝতে পারছ?

রেবতী আবার দাঁড়াল।

তা হলে আমাকে কি করতে হবে শুনি? চোয়াল ছুটো শক্ত হয়ে গেল তার। নাকের ডগা কুঁচকে উঠল, চোখ ছোট করে রেবতী মুকুন্দকে দেখছিল, যেন মুকুন্দর মুখ পরীক্ষা করছিল। আকাশের দিকে চোখ তুলে মুকুন্দ একটু ভাবল। তারপর পায়ের নিচে ঘাস দেখল। একটা ঢোক গিলল। তারপর অত্যন্ত সংযত ঠাণ্ডা গলায় বলল, তুমি যদি নিজেকে সংশোধন করতে না পার—তুমি যদি মনে মনে ঠিক করে থাক তোমার এই প্রবৃত্তি নিয়েই তুমি চিরকাল চলবে—তা হলে, তা হলে আমার মনে হয়, তোমার কলকাতা ফিরে যাওয়াই ভাল।

বেশ তাই যাব। রেবতী আবার ঘুরল। এবার সে বাড়ির দিকে হাঁটতে লাগল। মুকুন্দ পিছনে। কথা বলছিল না রেবতী। যেন নিজেকে বোঝাচ্ছিল সে। তাই তো, এই গাঁয়ে কি আশপাশের কোন গাঁয়ে নষ্টামি করলে মানুষটার সুনাম নষ্ট হবে—এ তল্লাটের বড় চাষী সে, সবাই তাকে চেনে জানে, এখানে তার স্ত্রী কেলেঙ্কারি করলে তার মুখে কালি লাগবে।

মুকুন্দও কোনো কথা না বলে হাঁটছিল।

তবে আমি গলা বড় করে সবাইকে ডেকে বলতে পারি, আমি বেশ্যা, মুকুন্দ রায়ের বৌ নই, তার রক্ষিতা হয়ে এবাড়ি আছি—ছিলাম, কাজেই আমার কিছু লুকোবার ছিল না।

তুমি কি থামবে না—হঠাৎ যেন অনুনয়ের সুর শোনা গেল মুকুন্দর গলায়।

যা বলার ঘরে গিয়ে বলো, এখানে নয়, রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে কোনো কথাই হয় না।

আশ্চর্য, রেবতী ফিক করে হাসল।

কেউ নেই, কেউ কি শুনছে আমার কথা তোমার কথা? চারদিকে কেবল ঝোপঝাড় আর পাখির কিচিরমিচির।

যেন একটু আশ্বস্ত হল মুকুন্দ। দু'ধারে বনতুলসী আর কাঁটানটের ঝোপ ছাড়া আর কিছু ছিল না। কোনো মানুষ ছিল না। বেলা যত বাড়ছিল রোদ তত উজ্জ্বল হচ্ছিল উত্তপ্ত হচ্ছিল। মাথার ওপর গাছের ডালে ডালে অজস্র পাখি উড়ছিল শব্দ করছিল। বাঁ হাত থেকে বন্দুকটা ডান হাতে নিল মুকুন্দ। তার কপালে ঘাড়ে অসংখ্য ঘামের ফোঁটা দেখা দিয়েছে।

মুকুন্দর সেই পোষাক। বারান্দায় পায়চারী করছে। বন্দুকটা এক পাশে দেওয়ালের সঙ্গে ঠেকিয়ে দাঁড় করানো। ঘরের ভিতর খুটখাট শব্দ করছিল রেবতী। মুকুন্দ একবার হাতের ঘড়ি দেখল। বারোটা বাজে।

ঘড়ি থেকে সে চোখ তোলার সঙ্গে সঙ্গে রেবতী ঘর থেকে বেরিয়ে এল। খুব একটা অবাক হল না মুকুন্দ। যেন এমন একটা কিছু সে আশঙ্কা করছিল। সিল্কের শাড়ি খুলে ফেলে রেবতী সাদামাঠা মিলের শাড়ি পরেছে, সিল্কের ব্লাউজ রেখে সুতীর ব্লাউজ গায়ে চড়িয়েছে। পায়ে সু নেই, সস্তা চটি, যে চটি পরে সে কলকাতার রাস্তায় হাঁটত। হাতে পুরোনো ফাইবারের সুটকেস্‌টা।

এই অবেলায় তুমি কোথায় চললে? মুকুন্দ তার পথ রুখে দাঁড়াল।

তুমি জান আমি কোথায় যাচ্ছি।

কিন্তু এভাবে—স্নান নেই খাওয়া নেই। মুকুন্দ বিড় বিড় করে উঠল।

ক'দিন তো খেয়ে গেলাম তোমার এখানে। রেবতী একটু হাসল। যেন কোনও মালিন্য তার মনে নেই, কোনও খেদ নেই, এমন অসময়ে অস্নান অভুক্ত থেকে এখান থেকে চলে যাচ্ছে।

আজ না গেলেই কি চলত না? মুকুন্দ তার হাত ধরতে যাচ্ছিল। রেবতী হাত সরিয়ে নিল।

রাস্তা ছেড়ে দাও—যাবার সময় বিরক্ত করো না। ভুরু কুঁচকোলো না সে। অত্যন্ত সহজ পরিচ্ছন্ন গলায় বলল কাল, গেলেও যেতে হবে, আজ গেলেও যাব। মুকুন্দ হাত ধরতে সাহস পেল না। চোয়াল দুটো শক্ত করে রাখল। রেবতী বারান্দার সিঁড়ি বেয়ে উঠোনে নামল। যেন আগুন জ্বলছিল মাথার ওপর। খটখটে রোদ। বসন্তের দুপুর এত তেতে উঠতে পারে চোখে না দেখলে বিশ্বাস হত না।

রেবতীর পিছু পিছু মুকুন্দ উঠোনে নামল। সঙ্গে সঙ্গে এক ঝাঁক পায়রা উঠোন ছেড়ে ঘরের চালের ওপর উঠে গেল। সারা উঠোনে কলাই ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। নতুন কাটা ফসল রোদ্রে শুকোচ্ছে। এতবড় একটা বাঁশ হাতে নিয়ে বলাই উঠোনের চারিদিকে হৈ-হৈ করে ঘুরছে। রোদের তেজের চেয়েও বুড়োর চোখের তেজ যেন অনেক বেশি। দরদর করে ঘামের স্রোত নামছে গলা পিঠ বেয়ে। কিন্তু ভ্রূক্ষেপ নেই। তার তেজী চোখের দৃষ্টি একবার আকাশে উঠে যাচ্ছে আবার তৎক্ষণাৎ উঠোনময় ছড়ানো কলাইয়ের আঁটির ওপর নেমে আসছে। কাকটি নিচে নামতে পারছে না, শালিকটি ধারে কাছে ঘেঁষতে পারছে না। ফাঁক বুঝে বুঝে মুকুন্দর পোষা পায়রার ঝাঁক শুধু উঠোনে নেমে আসছে। বলাই তখন হাতের বাঁশ গুটিয়ে নেয়, ওদের বাধা দেয় না।

উঠোন পার হয়ে রেবতী সদরের ফুল বাগিচার কাছে চলে গেল। মুকুন্দ পিছনে হাঁটছিল।

শোন। আর একবার সে ডাকল। রেবতী ঘাড় ফেরাল।

তুমি কি স্টেশনের পথ চেন—হেঁটে এতটা পথ যেতে পারবে?

মানুষকে জিজ্ঞেস করে করে চলে যাব, হেঁটেই চলে যাব। হেঁটে আমার অভ্যেস আছে।

মুকুন্দ কথা বলছিল না।

রেবতী হাঁটছিল। কিন্তু কি ভেবে আর একবার সে দাঁড়াল। ঘাড় বাঁকিয়ে মুকুন্দর দিকে চেয়ে কেমন করে যেন হাসল।

ক বছর ধরে সমানে শুধু হাঁটছি। শেয়ালদা বৌবাজারের রাস্তায় হেঁটে হেঁটে পায়ে ফোস্কা পড়ে যেত এক একদিন। তুমিও কোনোদিন দেখেছিলে আমার সেই হাঁটা—তাই না?

শোন, আমি একটা কথা বলছি—রাখবে আমার কথা? মুকুন্দর গলার স্বর কাঁপছিল।

রেবতী আকাশের দিকে তাকাল।

রাখবার মতন কথা হলে নিশ্চয় রাখব।

আমাকে তুমি অবিশ্বাস করো না। রেবতীর কাঁধে হাত রাখল মুকুন্দ।

কাঁধ থেকে আস্তে হাতটা নামিয়ে দিয়ে রেবতী একটা গাঢ় নিশ্বাস ফেলল। যেন নিজের মনে একটু হাসল। তারপর মুকুন্দর চোখে চোখ রেখে বলল, শোন, বিশ্বাস অবিশ্বাসের পালা কাল সকালেই শেষ হয়ে গেছে। তুমি কোনোদিন আমায় বিশ্বাস করতে পারবে না—আর তোমার অবিশ্বাস দেখে আমার বিশ্বাস বলো, প্রেম বলো, ভক্তি বলো—হুঁ, যখন স্ত্রীর মর্যাদা দিতে চেয়েছিলে তখন তোমার চেয়ে আমার ভক্তির পাত্র আর কে বা ছিল—কিন্তু সব কেমন গুঁড়িয়ে গেল, ধুলো হয়ে গেল।

রেবতী! মুকুন্দ আবার তার কাঁধে হাত রাখল। এতবড় একটা পুরুষের চোখ ছলছল করছে কেমন অদ্ভুত লাগল রেবতীর। এবার কাঁধ থেকে ভারি শক্ত লোমশ হাতটা সে নামিয়ে দিল না। ঘাড়

ফিরিয়ে মাঠের রাস্তাটা আর একবার দেখল। তারপর নরম গলায় বলল, কেন এভাবে তুমি আমায় বাধা দিতে চাইছ—আমাকে অনেকটা পথ হাঁটতে হবে, হয়তো বেলা পড়ে যাবে রেল স্টেশনে পৌঁছোতে—সন্ধ্যার ট্রেন না ধরতে পারলে আমাকে ভয়ানক অসুবিধায় পড়তে হবে বুঝতে পাচ্ছ?

তাই তো বলছিলাম। মুকুন্দর ঠোঁট দুটো থরথর করে কেঁপে উঠল। সারাজীবন হেঁটেছ। আবার সেই জীবনে ফিরে যেতে চাইছ, এ আমি কেমন করে—কান্নার ধমক রুখল মুকুন্দ, তারপর গলা পরিষ্কার করে আবার বলল, একটা সুখের জীবন শান্তির জীবন—একটা স্থায়ী জীবন কি সত্যি ভাল লাগল না তোমার?

আবার সেই কথা—ভাল লাগতে দিলে কোথায়! রেবতীর গলার স্বর স্পষ্ট হয়ে উঠল। সুখের জীবন, স্থায়ী জীবন, শান্তির জীবন—কত কি বলে রাস্তা থেকে তুলে ঘরে নিয়ে এসেছিলে সে তো আমিও জানি—কিন্তু, কিন্তু দুপদ সোনার গয়নার কথা যাকে বলতে সাহস পেলে না, হুঁ, কথাটা শুধু আমাকে একবার বলা, বললে কিছু আমি তোমার সেই বৌয়ের গয়নার জন্য আব্দার করতাম না ঠিকই, কিন্তু বলবে কি—তাড়াতাড়ি বাক্সটা ঘর থেকে সরিয়ে নিয়ে গেলে—কাজেই বুঝতে পারছ—ঘাড় ঘুরিয়ে ঝোপের ওপর থুথু ফেলল রেবতী।

ইস্—আবার সেই কথা! মুকুন্দ মাথা ঝাঁকাল, যেন মাথার চুল ছিঁড়তে মাথায় হাত রাখল। বেশ তো, তুমি ঘরে চল, এখনি বলাইদার কাছ থেকে চাবি চেয়ে নিয়ে বাক্স খুলে তোমায় দেখাব, বাক্স খুলে দেখাব সিন্দুক খুলে দেখাব—হুঁ, যদি অন্য কোনো ঘরে আর কোনো পেটরা তোরঙ্গ থাকে—

থাক। রেবতী হাত তুলে বাধা দিল আমার দেখে দরকার নেই—যা বুঝবার আমি বুঝে গেছি—একটু থেমে রেবতী আবার বলল, রাত্রে বলাই ঘুমোচ্ছিল—কিন্তু সকালে বাড়ি থেকে যখন

বেরোই, তখন অন্তত একটা মানুষের মনের বিশ্বাস যাতে তছনছ হয়ে না যায়—চাবি চেয়ে নিয়ে কাজটা তুমি করতে পারতে—কথা শেষ হবার আগে রেবতীর নাকের ডগা কুঁচকে উঠল।

যেন মুকুন্দর চোখে আগুন জ্বলে উঠল।

বলাইদা তখন মাঠে গিয়েছিল। যদি বাড়িতে থাকত তো নিশ্চয় তখনি—চিৎকার করে উঠল সে।

রেবতী ঠাণ্ডা গলায় হাসল।

তোমার বলাইদার কাছ থেকে কখনই চাবি আদায় করতে পারবে না।

কেন? উত্তেজনায় মুকুন্দ কাঁপতে লাগল। আমার বাক্স আমার সিন্দুক, আমার চাবি—তুমি একথা বলছ কেন—এক্ষুনি আমি চাবি চেয়ে নিয়ে—এসো তুমি ঘরে এসো।

রেবতী নড়ল না। একটা এরণ্ড গাছের ছোট মতন ছায়া ঘেঁষে দাঁড়িয়ে রইল। একটা কোকিল ভয়ানক চিৎকার করে ডাকছিল।

আশ্চর্য, এখনও তোমার বিশ্বাস হচ্ছে না, দাঁড়াও। এক সেকেণ্ড দাঁড়াও—চলে যেও না, তোমার পায়ে ধরে বলছি—আমি চাবি চেয়ে এনে তোমায় দেখাচ্ছি—তারপর আমার সঙ্গে ঘরে ফিরে যাবে।

রেবতী এবার ঘাড় কাত করল। যেন একটা কৌতুকের ঝলমল চোখে নিয়ে ব্যস্ত ক্ষুব্ধ উত্তেজিত মানুষটাকে দেখল। মুকুন্দ ছুটে বাড়ির দিকে চলল।

দু মিনিট তিন মিনিট। যেন ঝড়ের বেগে সে ছুটে গিয়েছিল, তেমনি একটা ক্লান্ত বিষণ্ণ স্তিমিত চেহারা নিয়ে মুকুন্দ ফিরে এল।

পেলে চাবি? রেবতী শুকনো একটা ঢোক গিলল।

মুকুন্দ একটা চাপা নিশ্বাস ফেলল। চোখ নামিয়ে রেবতীর পা দুটো দেখল। তারপর তার চোখে চোখ রাখল।

তুমি এসো। বুড়োর হঠাৎ মেজাজ খারাপ হয়ে গেছে, চাকরটা কলাইর আঁটির ওপর দিয়া ঘরের নোংরা টেনে নিচ্ছিল, রেগে

গেছে মানুষটা—একটু পরেই আমি চাবি চেয়ে নেব, এখন তুমি ঘরে এসো।

রেবতী খিলখিল করে হাসল।

কোনোদিনই তুমি চাবি আদায় করতে পারবে না আমায়ও বাক্স খুলে দেখাতে পারবে না। চলি— রেবতী ঘুরে যাচ্ছিল।

মুকুন্দ তার হাত চেপে ধরল।

উঃ, এত অবিশ্বাস তোমার তুমি এত নিষ্ঠুর! মুকুন্দর আগুন জ্বলা চোখে আবার জল এসে গেল। এসো, লক্ষ্মীটি—তোমার পায়ে ধরে বলছি এভাবে আমাকে কষ্ট দিও না, একবার আমাকে বিশ্বাস করো—ঘরে এসো, আমি তোমাকে আমার বাক্স সিন্দুক পেটরা আলমারী সব খুলে খুলে দেখাব।

কিন্তু চাবি পাবে কোথায়—বলাই তোমাকে চাবি দেবে না।

দেবে না, আমি জোর করে আদায় করব তখন। এসো। ঘনঘন নিশ্বাস পড়ছিল মুকুন্দর, যেন ঠোঁটে কথা বাধছিল। বাহাত্তর বছরের কুঁকড়ে যাওয়া বুড়ো—গায়ের জোরে আমি তার সঙ্গে পারব এটা নিশ্চয় বিশ্বাস করছ। এসো।

চাবির ছড়াটা আগে চেয়ে নিয়ে এসো, আমি চোখে দেখি, তারপর তোমার ঘরে যাব। যেন ছোট মেয়ের মতন রেবতী আব্দারের সুর করল, ভুরু কপালে তুলল, তারপর চিবুক উঁচু করে আকাশ দেখতে লাগল।

উঃ, এত পরীক্ষা করছ তুমি, বেশ যেও না, তুমি দাঁড়াও—আবার একটা উদ্দাম ঝড়ো হাওয়া হয়ে মুকুন্দ বাড়ির দিকে ছুটল।

দু মিনিট তিন মিনিট। কোকিলটা থেমে গিয়েছিল। টি-টি করে একটা টিয়া ডাকছিল মাথার ওপর। তেতে ওঠা হাওয়ার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কাছের কোন একটা আমগাছ থেকে আমের বোলের কড়া গন্ধ ছুটে আসছিল। রেবতী একটা হাই তুলল। হাত দিয়ে খোঁপাটা একবার ছুঁয়ে দেখল। ঠিক সেই মুহূর্তে, যেন হঠাৎ ওবাড়িতে

একটা চিৎকার শোনা গেল প্রথমটায়, যেন বলাইর গলার আওয়াজটা কানে এল—তারপর আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে রেবতীর দু' কান বধির করে দিয়ে একটা বন্দুক গর্জন করে উঠল।

রেবতী ভয়ে কাঠ হয়ে গেল। হঠাৎ ভেবে ঠিক করতে পারল না এই মুহূর্তে সে কি স্টেশনের দিকে ছুটে চলে যাবে, না কি বাড়ি ফিরে যাবে। কিন্তু বাড়ি গেলে যদি একটা গণ্ডগোলের মধ্যে তাকে জড়িয়ে পড়তে হয়—কিন্তু স্টেশনের দিকেও এভাবে, এমন অসময়ে ছুটে যাওয়ার বিপদ কম কি।

একটা আতঙ্ক নিয়ে, বিমূঢ় দ্বিধা নিয়ে গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে সে কাঁপতে লাগল। আর ঠিক তখন হাতে, রক্ত নিয়ে জামায় রক্ত নিয়ে এত বড় একটা চাবির ছড়া আঙুলে ঝুলিয়ে মুকুন্দ হাসতে হাসতে তার সামনে এসে দাঁড়াল।
